[আমাদের ছুটি – ৪১শ সংখ্যা]

কাম্বোডিয়ার আঙ্করভাট মন্দির চত্বরে - আলোকচিত্রী শ্রী তপন পাল

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

সবুজ দ্বীপ মৌসুনি

অর্পিতা চক্রবর্তী

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম মূলখরকা ট্রেক করার পর কোথায় যাওয়া যায়,আবার লকডাউনে কোথাও বেড়ানোর প্ল্যান করতেও ভয় লাগছিল। সময়টা হল ফেব্রুয়ারি মাস, ২০২২। ইতিমধ্যে এই দুবছরে হাতে স্টিয়ারিং তুলে নিয়ে গাড়ি চালানোটাও মা-বাবার আশীর্বাদে বেশ রপ্ত করেছি। টুকটাক এখানে ওখানে, মানে একটু দূরে গাড়ি নিয়ে যাওয়াও হচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় একটা প্ল্যান এল। কাছাকাছি সমুদ্রে গেলে কেমন হয়? কিন্তু কোথায় যাব? দিঘা, মন্দারমণি যাওয়া ঠিক হবে না, একটু বেশি ভিড় হয় এই জায়গাগুলিতে। তখনও কোভিডের ভয় সবার মাথাতেই চেপে বসেছিল। তারপর কুহু আর কুহান। দুজনেই খুব ছোটো - ৩ বছর আর ৯ বছর। তাহলে কোথায়? মাথায় এলো, বকখালি গেলে কেমন হয়? হয়তো একটু কম ভিড় হবে। নেটদুনিয়ায় বকখালির বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করতে করতে হঠাৎই একটা জায়গায় থমকে চোখ গেল। পশ্চিমবঙ্গের একদম শেষ, দক্ষিণপ্রান্তে একটি ছোট দ্বীপ, মৌসুনি নাম। তিন দিকে বঙ্গোপসাগর ও একদিকে একটি ছোট্ট নদী। খুবই নির্জন এই জায়গাটি। কেউ যদি গুগল-এ এই দ্বীপটির লোকেশন সার্চ করে, দেখতে পাবে চারদিকে জল আর সবুজে ঘেরা গাছের সারি। কলকাতা থেকে কমবেশি ৮০ কিমি, গাড়িতে প্রায় চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। আর কোনও কিছু না ভেবে নতুন স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমেই বলে রাখি যে, মৌসুনি দ্বীপে গেলে পুরোটা গাড়ি নিয়ে কখনোই যাওয়া যাবে না। ডায়মন্ড হারবার হয়ে নামখানা ব্রিজ পেরিয়ে হুজ্জুতির ফেরিঘাটে এসে গাড়ি পার্ক করে রেখে বাকিটা নৌকায় যেতে হবে।

নদীপথে যেতে যেতে চারদিকে সবুজঘেরা দ্বীপটির কাছে যতই এগোচ্ছি, এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। ওপাড়ে গিয়ে দ্বীপে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হওয়ার হয়তো আরও কিছুটা বাকি ছিল। একটি ছোট্ট গ্রামকে প্রকৃতি যে কত সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না।

হোটেল বলে মৌসুনিতে কিছু নেই। গ্রামের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছোট ছোট ক্যাম্প তৈরি হয়েছে, যেখানে আছে অনেক কটেজ, তাঁবু, মাটির বাড়ি। মোটামুটি ভাড়া পড়বে হাজার থেকে বারোশো টাকার মধ্যে। অফসিজন বলতে তেমন কিছু নেই। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে যেকোনও সময়েই যাওয়া যায়। তবে ছুটির দিন আর বিশেষ দিনগুলোতে ভাড়া একটু বাড়তে পারে, যেমন দোল-এর আশপাশে, স্বাধীনতা দিবস, পুজোতে, বড়দিনে। আর এদের খরচের মধ্যে ধরা থাকে প্রথম দিনের দুপুরের খাবার থেকে পরের দিনের সকালের জলখাবার অবধি। প্রথম দিন গিয়ে যেটা দেখলাম চারদিকে নারকেল গাছ আর প্রত্যেকটা গাছে অজস্র সবুজ ডাব। ঘন ঝাউয়ের জঙ্গল আর সমুদ্রের জল প্রকৃতিকে যেন আলাদা একটা মাত্রা এনে দিয়েছে। ক্যাম্পে যাওয়ার পরই আমাদেরকে ডাবের জল দিয়ে স্বাগত জানানো হল। স্নান সেরে যখন দুপুরের খাবার খেতে বসলাম, দেখি সে তো এক এলাহি ব্যাপার! কাতলার কালিয়া, গলদা চিংড়ি, ডাল, আলুভাজা, চাটনি, পাঁপড়। আমরা তো আবার আলাদা করে কাঁকড়ার রসাও খেয়েছিলাম। দুপুরের খাওয়ার পরে দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখলাম। সমুদ্রের পাশে এঁটেল মাটি। কিছু কিছু জায়গা বেশি পিছল ও কাদা, মনে হয় সেই জায়গাটিই নদী ও সাগরের মিলনস্থল। তবে আমরা মোহনা পরেরদিন ভোরে দেখতে যাব বলে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সন্ধ্যেও হয়ে আসছিল।

সন্ধ্যে নামার পর অসাধারণ সাজ চোখে পড়ল। সত্যি কথা বলতে কী আঁধার রাতে প্রকৃতি যে কত মোহময় হয়ে উঠতে পারে আমার জানা ছিল না। আমাদের ক্যাম্পটা চারদিকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। একটা ফাঁকা জায়গায় অনেক শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, মনে হল ক্যাম্পফায়ার হবে। সত্যি, এক অসাধারণ অনুভূতি! আগুনের ওপর জাল বিছিয়ে মুরগির মাংস পোড়ানো হচ্ছিল। এ যেন আদিম যুগের মানুষের মতো পোড়া মাংস খাবার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাস্তবে ফিরে আসতে হল। একজন এসে হাতের ওপরে মুড়ি মাখা আর বেগুনির একটা প্যাকেট দিয়ে গেল। আর বলে গেল, একটুপরেই সেই পোড়া মাংস খাবার অভিজ্ঞতা হবে।

যাইহোক, রাতের দিকে সমুদ্রের পাশে ঘুরতে গিয়েছিলাম, দেখি সৈকতের ওপর ছোট ছোট কাঁকড়ায় ছেয়ে আছে। মোবাইলের আলো পড়তেই তারা পালাল। দিঘা, মন্দারমণিতেও ঘুরতে গিয়েছি কিন্তু রাতের সমুদ্রের এত মোহময় সৌন্দর্য আর তার সঙ্গে পোড়া মাংস উপভোগ - এই অভিজ্ঞতা প্রথম। অনেকক্ষণ সমুদ্রের পাড়ে বসেছিলাম। ঘোর কাটল যখন রাতের খাবারের ডাক এল। ঘড়িতে রাত দশটা। ভাত-রুটি-র সঙ্গে কষা মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। সারাদিনের প্রচুর ক্লান্তির জন্য রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লাম। এই প্রথম মাটির বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা হল।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোলাম। মৌসুনি গ্রামটিকে ঘুরে দেখলাম। প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটি হল,এই গ্রামটিতে মানুষজন যত না থাকে, তার চেয়েও বেশি হয়তো হাঁস মুরগির বসবাস। কী সুন্দর! কত হাঁস গ্রামের পুকুরগুলিতে চরে বেড়াচ্ছে। কিছু মুরগি আর হাঁস একসঙ্গে খাবারও খাচ্ছে। কোনও মানুষকেই ভয় পাচ্ছে না। একটা মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ল। সেটি হল ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব। ইয়াস ঝড় এই গ্রামটির যে কী ক্ষতি করেছে তা বলে বোঝানোর নয়। কংক্রিটের বাড়ি কীভাবে ভেঙে পড়ে তা এই গ্রামটিকে দেখে বোঝা যাবে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি এখনও

এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখন আবার মোহনার পলিমাটি তুলে নতুন করে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এই লেখাটির শেষে আমাদের মৌসুনি ভ্রমণের দুটি ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে। আপনারা দেখবেন, নিজেই বুঝতে পারবেন। কিছু মানুষের কথোপকথন-ও তুলে ধরা আছে। যাইহোক, সকালে খালি পায়ে কাদামাটি মেখে নৌকা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই অনেক ছোট ছোট দ্বীপ আছে। গঙ্গাসাগর দ্বীপটিও খুব সুন্দর দেখতে। সব দ্বীপই সবুজ চাদরে মোড়া। বেশ মোহিত হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে একটি দ্বীপের কথা না বললেই নয়। সেটি হল জম্বু দ্বীপ। দ্বীপটি বড়ই সুন্দর, কিন্তু কোনও পর্যটককেই যেতে দেওয়া হয় না। কারণ প্রচুর পাখির বসবাস এখানে। আগে অনুমতি পাওয়া যেত। এখন আর যেতে দেয় না। তবে হ্যাঁ, ওখানকার স্থানীয় কোনও লোককে যদি রাজি করাতে পারেন, তবে তো সোনায় সোহাগা। দেখে আসুন জম্বু দ্বীপ। আমাদের কপালে হয়নি যদিও। নৌকাভ্রমণে আপনার সঙ্গী হবে প্রচুর সাদা বক আর পরিযায়ী পাখিরা। আর একটা কথা, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে একটা জিনিসে খুব মজা হয়েছে, তা হল খেজুরের রস খাওয়া। ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দিল। ক্যাম্পে ফিরে সকালের খাবারের ডাক পড়ল, লুচি-তরকারি, ডিম সিদ্ধ, রসগোল্লা। এবার ফেরার পালা। দুদিনের ছুটি কিভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। টোটোতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল কত কষ্টের এদের জীবনযাত্রা। নদী ছাড়া শহরে আসার উপায় নেই, প্রাকৃতিক দুর্যোগে রেহাই নেই, পর্যটক ছাড়া অনেকেরই আয়ের পথ প্রায় বন্ধ। তবু কত আনন্দে থাকে এরা। ভালো রাখুক ঈশ্বর এদের।

মৌসুনি দ্বীপ ভ্রমণের ইউটিউব লিঙ্কঃ
https://youtu.be/_oK1keHOMvE
https://youtu.be/zQBGHLrx8Vc

পেশায় শিক্ষিকা হলেও কর্মস্থল আর সংসার সামলে অর্পিতা চক্রবর্তী গাছ, জল, মাটি আর পাহাড় দেখার টানে বেরিয়ে পড়েন মাঝেমধ্যেই। "আমাদের ছুটি" কে পেয়ে সেইসব দেখাকে লেখার রূপ দেওয়ার সুপ্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।

Comments

Name

Enter your comment here

আমাদের ছুটি – ৪১শ সংখ্যা

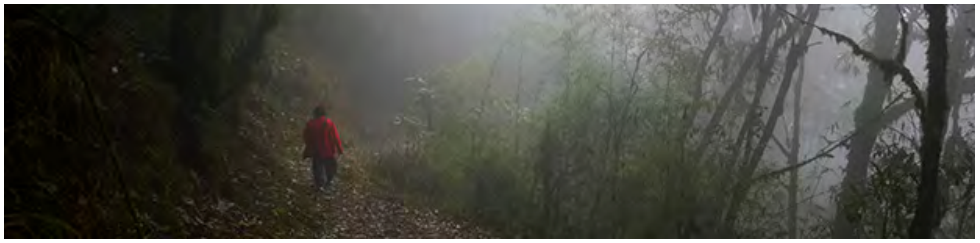

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

১২শ বর্ষ ২য় সংখ্য
ভাদ্র -

ছোট ছোট সামান্য সামান্য দেখা জুড়ে জুড়েই যে একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনি হতে পারে তা প্রথম চিনিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। দেখা আর লেখার ভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বিশেষ করে বইগুলি পড়লেও মনে

অমরনাথ দর্শন — নিবেদিতা কবিরাজ

~ ভুবনডাঙা ~

একলা মেয়ের ইথিওপিয়ায় — যশোধরা রায়চৌধুরী

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়া — সাতান্ন বছর পরে আবার
তপন পাল

তানজানিয়ার ওলডুভাই গর্জ — দেবযানী চক্রবর্তী

~ শেষ পাতা ~

তেমলিং — সাধু ও সাধুর ট্রেকিং — প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ফ্রেডেরিক নগরের সেমেট্রিতে

গৌরব বিশ্বাস

"কাল তো বলছ বেরোবে। কিন্তু ক'দিন যা রোদ হচ্ছে দেখেছ? ঝলসে দিচ্ছে এক্কেবারে। আর দূরও তো অনেক।" একটু মিনতি করেই বললাম আমি।
"ধ্যাড়, আমি সারাদিন অফিস করে এই ঢুকলাম। রোদ আবার কী? ও তো থাকবেই। আর তুই কী এত দূর দূর করিস?"ফোনের ওপার থেকে বলল অনির্বাণদা।
আমি একটু এড়াতেই চাইছিলাম। রোববার দুপুরে কোথায় একটু ভালো-মন্দ খেয়ে কোলবালিশ জড়িয়ে ভাতঘুম দেব তা না,সারাদিন ভাদরের পচা রোদে টো-টো করে ঘুরতে হবে!তার ওপর সন্ধ্যেবেলা ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ম্যাচ। অত দূরে গেলে সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারব কিনা তাও জানিনা।
যাওয়ার কথা হচ্ছিল উত্তরপাড়া। সেখানে একটি আর্কাইভ ঘুরে দেখবার ইচ্ছে। অনির্বাণদা আগে থেকে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করেই রেখেছিল। কিন্তু সে আর্কাইভ রোববার বিকেল তিনটের আগে খোলে না। সেটাই আমার বেঁকে বসবার প্রধান কারণ। তাহলে, সারাদিন রোদে মিছি মিছি ঘুরে মরব!
বিকল্প প্ল্যান বাতলে দিল অনির্বাণদা-ই - " বেশ তো, এক কাজ করি। আমরা শ্রীরামপুরটা ঘুরে নিই। ওখানকার সেমেট্রিগুলো ঘুরে দেখি। আমাদের সেমেট্রি প্রজেক্টের কাজটাও এগিয়ে যাবে। এছাড়াও ড্যানিশ চার্চ-টার্চ, অনেক কিছুই দেখবার আছে শ্রীরামপুরে। সারাদিন সময় কেটে যাবে। তারপর দুপুর নাগাদ ট্রেন ধরে উত্তরপাড়া গেলেই হল। শ্রীরামপুর থেকে গোটা দু-তিন স্টেশন।"
এই প্রস্তাবটা মনে ধরল। এ শহর, শহরতলি ঘুরে বেড়াই সমাহিত অশ্রুত স্বরের খোঁজে। অতঃপর রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বসে পড়লাম বেঙ্গল অবিচুয়ারি আর উইলসন-এর বেঙ্গল এপিটাফ নিয়ে। কলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঔপনিবেশিক আমলের কবরখানাগুলোর খোঁজ করতে এ বইদুটোর জুড়ি নেই।
বইপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনেক রাত গড়িয়ে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আটটা বাজে। সব্বনাশ! নটা চল্লিশের কল্যাণী সীমান্ত ধরতে বোধহয় আর পারব না।
কোনরকমে স্নান সেরে সামান্য কিছু টিফিন মুখে গুঁজে দে-ছুট। বেলঘড়িয়ার এক নম্বরে যখন পৌঁছালাম, কল্যাণী সীমান্ত তখন হর্ন বাজিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। ট্রেনে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে অনির্বাণদাকে ফোন -" উঠে পড়েছি। তুমিও উঠে পড়ো।"

ব্যারাকপুরে নেমে বাস ধরে ফেরিঘাট। নদী পেরিয়ে শ্রীরামপুরে পা রাখা। বেশ একটা ছিমছাম বিগত দিনের চার্ম আছে শ্রীরামপুরের বাতাসে। দু-এক পা যেতে না যেতেই কলোনিয়াল যুগের পুরনো সব বিল্ডিং। কোনটা রেস্টোর করা হয়েছে। কিছু আবার জীর্ণ, বট-অশ্বত্থের স্নেহধন্য। চোখে পড়ল মিশন গার্লস হাইস্কুল। ১৯২৭-এর বিল্ডিং। একশো বছরও পেরোয়নি। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ফলকটি না থাকলে, পোড়ো বাড়ি বলে ভুল হওয়া আশ্চর্যের নয়। গেট বন্ধ, তাই ঢুকে দেখার মনস্কামনা পূর্ণ হল না। ইচ্ছে করে এসব বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখি। হাত বুলিয়ে দিই জীর্ণ শরীরের গায়ে। শুনব তাদের অন্তরের গহন কথা। সময় বয়ে যাবে স্রোতের মতো।
মা-কে একটা ফোন - পৌঁছসংবাদ দিয়ে দিলাম। তবে খেয়া পেরিয়েছি সে কথা বলিনি। মা বলে, জলে নাকি আমার ফাঁড়া আছে। তখনও ধারণা করতে পারিনি, সামনের গোটা দিনটা কী মারাত্মক হতাশাজনক হতে চলেছে।
আমরা আগে যাব কেরী সাহেবের সমাধি দেখতে। শুধু কেরী তো নন, একইসঙ্গে মার্শম্যান এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের সমাধিও আছে।
চেপে বসলাম অটোতে। অটো কাকা নাকি সব চেনে এ শহরের। অটো চালাতে চালাতে রীতিমত আমাদের গাইডের ভূমিকা পালন করছে কাকা। ওমুক রাস্তা দিয়ে গেলে তমুক দেখা যাবে - আমাদের চেনাতে চেনাতে চলেছে।
বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর এক রাস্তার মুখে নামিয়ে দিয়ে বলল – এই তো এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে কেরী সাহেবের সমাধি। এই বলে কাকা বিদেয় নিল।
স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করতে গন্ডগোলটা বুঝতে পারলাম। এখানে কোথায় কেরী সাহেবের সমাধি! সে তো ব্রজ দত্ত লেনে। কাকা পুরো উল্টো জায়গায় এনে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে।

উল্টোদিকের একটা মুদির দোকানে কয়েকজন বৃদ্ধ রবিবাসরীয় আড্ডা জমিয়েছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম-' ইয়ে, বলছিলাম যে, এটায় ঢুকতে দেয় না?"
"ওই ছোট্ট ঘরখানা দেখছেন, ওতে কেয়ারটেকার থাকে।" এক বৃদ্ধ উপায় বাতলে দিলেন।
বারচারেক দরজা ধাক্কাতে, দরজা খুলে মুখ বাড়াল কবরখানার কেয়ারটেকার। বেচারার সুখনিদ্রা যে আমরা চটকে দিয়েছি, সেটা ওর নিমের পাঁচন-মার্কা থোবড়া দেখেই বুঝতে বাকি রইল না। ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম-'একটু ঢোকা যাবে?"
"কলেজ থেকে পারমিশন লিখিয়ে এনেছেন?" তেতো গলায় জিজ্ঞেস করল চৌকিদার।
আমরা মাথা নাড়ি।
"তাহলে ঢুকতে দেওয়া যাবে না" - সাফ উত্তর।
সেমেট্রিতে ঢুকতে গেলে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে পারমিশন করাতে হবে, তেমন তো জানা ছিল না।
নানান কাকুতি মিনতি করে বহু চেষ্টা করলাম। কিন্তু চিঁড়ে ভিজল না। চৌকিদার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। এই সেমেট্রি নাকি শ্রীরামপুর কলেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রাইভেট প্রপার্টি। ব্যাজার মুখে যখন ফিরে যাচ্ছি, দোকানের বৃদ্ধরা বলছে-'ওহ, আমাকে আপনাকে ঢুকতে দেবে না দাদা। ফরেন ডেলিগেট আসলে সব সুড়সুড় করে ঢুকিয়ে নেয়'।
এই অভিযোগের সত্যিমিথ্যে জানিনা। তবে, আমার বিভিন্ন সমাধিক্ষেত্র ঘোরার স্বল্প অভিজ্ঞতা বলে- এইটুকু একটা সমাধিক্ষেত্র, যেখানে কুড়িটা কবরও নেই, রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা নজরদারি চালাতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথাই নয়, তার জন্য এত কড়াকড়ি হাস্যকর।

যাই হোক, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। ড্যানিশ সেমেট্রি তো আছে শ্রীরামপুরে। সেখানেই যাওয়া যাক। সেখানকার চৌকিদার আবার, সাহেব ভূতরা রোববার পার্টিতে ব্যস্ত, তাই দেখা হবে না - এই অজুহাতে আটকাবে কিনা কে জানে!
না, ড্যানিশ সেমেট্রি খুব উদার। গেট হাঁ করে খোলা। চৌকিদার, কেয়ারটেকার, গেটকিপারের বালাই নেই। চৌকিদার, এক সমাধির উপর চিৎপাত হয়ে রোববারের মধ্যাহ্নিদ্রায় সমাধিস্থ হয়েছেন। সুতরাং, নিশ্চিন্ত মনে আমাদের ঘুরে দেখতে বাধা নেই।
শ্রীরামপুর প্রায় পুরোটাই ড্যানিশদের হাতে গড়া। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্ক-এর তদানীন্তন সম্রাট ৬ষ্ঠ ফ্রেডেরিক-এর সম্মানে নামকরণ হয়েছিল ফ্রেডেরিক নগর। শহরটিকে তিলে তিলে গড়ে তোলার অগ্রপথিক দিনেমার ব্যক্তিত্বরা সমাধিস্থ রয়েছেন এখানে। সেইসঙ্গে এঁদের পারিবারিক প্রিয়জনেরাও রয়েছেন।
এখানে শেষশয্যা নিয়েছেন – শ্রীরামপুরের ড্যানিশ গভর্নর ওলে (ওলাভ) বীই। শ্রীরামপুরের যে বিখ্যাত ড্যানিশ চার্চ - সেন্ট ওলাভ'স, সেটা ওঁর আমলেই বানানো। আরও অনেক মান্যিগণ্যি ড্যানিশ ব্যক্তি এখানে রয়েছেন, কিন্তু সমস্যা একটাই। গোটা চারেক বাদে আর একটারও সমাধিরও ফলকের অস্তিত্ব নেই। বেমালুম হাওয়া। চারটে সমাধির ফলকের মধ্যে তিনটে পুরো আস্ত আছে - বীই, জেকব ক্রিফটিং, ক্যাস্পার টপ। আরেকটি ভেঙে চৌচির। পড়বার মতো অবস্থায় নেই। ওই তিনটে সমাধি বাদে আর কারা এখানে সমাহিত, সেটা জানা খুব মুস্কিলের। এমনকি, বেঙ্গল অবিচুরিতেও এই সেমেট্রির পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড নেই। দায়সারাভাবে সামান্য কয়েকটি নথিভুক্ত রয়েছে। একমাত্র সম্বল হতে পারে সেন্ট ওলাভ'স চার্চের রেকর্ড। অতএব হাঁটা লাগলাম চার্চের পথে।

চার্চের সামনে দাঁড়াতেই মনে কু ডাকল। গেট ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্ত দরজা একটা খোলা দেখছি। কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা স্কুটি দাঁড় করানো। অর্থাৎ ভিতরে লোক আছে। চার্চের সামনে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একটা ভেজা ঠান্ডা প্রাচীন গন্ধ নাকে লাগে। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করি। কোনও সাড়া নেই। মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকার পর, ভিতর থেকে কেয়ারটেকার গোছের একজন বেরিয়ে এল। কাকা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয় - ভিতরে ঢোকা যাবে না। ওদিকে চার্চের দেওয়ালে যে সময়সারণীর বোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা নেই রোববার বন্ধ। গুগলও বলছে রোববার বিকেল অবধি খোলা। তাই ঢুকতে না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু উত্তর যা পেলাম, তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। "আপনাদের সাথে অত হ্যাজাতে পারব না", এই হল কাকার এককথা। এমন উত্তরের পর আর অপেক্ষা করার মানে হয়না।
কিছুদিন বাদেই আবার শ্রীরামপুর যাব। আশা করি সেন্ট ওলাভ'স চার্চেও ঢুকব। চার্চের ভিতর ঘুরেও দেখব এবং এই কেয়ারটেকার কাকাটির জন্য কড়া দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও করে আসব।

কথায় আছে, মনেপ্রাণে ইতিহাস খুঁজতে চাইলে কোথাও না কোথাও তার সূত্র ঠিক জোগাড় হয়ে যাবেই। সেন্ট ওলাভ'স থেকে শূন্য হাতে ফিরলেও, আমায় ফেরায়নি 'বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট'।
আজকাল অনেক বেস্টসেলিং লেখক দাবি করেন, কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঔপনিবেশিক সম্পর্কিত তাঁর ওমুক লেখাটা সম্পূর্ণ মৌলিক। কিন্তু পাঠক জেনে রাখুন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসমস্ত কাজ 'বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট' এর কোনও প্রাচীন খন্ডে কোনও এক অখ্যাত পরিশ্রমী গবেষক পূর্বেই করে গেছেন।
সেদিন বাড়ি ফিরে তাই ঘেঁটেছি 'বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট'-এর খন্ডগুলো। এবারও আমায় নিরাশ করেনি সে। ১৯২১-এর এক খন্ডে রেভারেন্ড হস্টেন, শ্রীরামপুরের এই ড্যানিশ সেমেট্রির সবকটা সমাধির এপিটাফ উদ্ধার করেছিলেন। হস্টেনের এই লেখা থেকেই উদ্ধার করেছি ভেঙে যাওয়া চতুর্থ ফলকের সমাধির পরিচয় - Mrs. M.C. Rabeholm। সেই সঙ্গে খুঁজে পেয়েছি এখানে সমাধিস্থ বাকিদের এপিটাফও। দিনের শেষে জিত হয়তো আমাদেরই হল।
কলকাতা শহর এবং শহরতলির ব্রিটিশদের নিয়ে আলোচনা, বইপত্রের শেষ নেই। কিন্তু সেই তুলনায় দিনেমাররা কতকটা উপেক্ষিত। সমুদ্র উজিয়ে এদেশে এসে এই ছিমছাম শ্রীরামপুর গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা। দেশে আর ফিরে যাওয়া হয়নি। ফিরতে কি চেয়েছিলেন তাঁরা? কে জানে! দুটো গোটা শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। তাঁদের উত্তর-অধিকারীরা খোঁজ কি করেন তাঁদের? হয়তো খুঁজেছেন, কিন্তু নিষ্ফল হয়েছে সেসব প্রচেষ্টা।
একটি আন্তর্জাতিক জেনেলজিক্যাল সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করি আমি। তাদের ডেটাবেসে এই ড্যানিশ সেমেট্রির সমাধিগুলোর ব্যাপারে কোনো আপডেট ছিল না। ছবিসহ ডেটা সব আপলোড করে দিয়েছি। কোনও উত্তর-অধিকারী ভবিষ্যতে এঁদের সমাধির খোঁজ করলে এবার সহজেই পাবে।

স্নাতকোত্তর পর্বের পর লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেছেন গৌরব বিশ্বাস। রকমারি খাওয়া-দাওয়া, বই পড়া, ঘুরে বেড়ানো আর এক-আধটু লেখালেখি। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে প্রবন্ধ নিবন্ধ।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইতিহাসের সন্ধানে মুর্শিদাবাদে

সৌমাভ ঘোষ

~ মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~

পর্ব - এক

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যিই তাই। দূরদূরান্ত অনেক ঘোরা হলেও যাওয়া হয়নি সুবে-বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে তিনটি সুবা (বাংলা, অযোধ্যা বা আওধ এবং হায়দরাবাদ) উত্তরাধিকারসূত্রে নবাবি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে প্রথম ছিল বাংলা। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার ফাঁকে ফাঁকে জন কে-র "দ্য অনারেবল কোম্পানি! আ হিস্ট্রি অফ দ্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি"–পড়তে পড়তে ছোটবেলার ইতিহাস ক্লাসের কথা মনে পড়ছিল এবং সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ দেখতে যেতেও মনের গোপনে একটা সুপ্ত বাসনা জাগছিল। কিন্তু বিধি বাম! করোনার উপদ্রব। বাড়ি, ব্যাঙ্ক ও বাজার ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবাও পাপ। তাই মনের বাসনাকে মনেই রাখা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি একটু ঠিক হতেই, হঠাৎ করে একঘেয়ে কাজের থেকে দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। একদিকে করোনার প্রকোপ আর অন্যদিকে এই বাড়ির মধ্যে পুরো বন্দী হয়ে থেকে জীবন একপ্রকার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই দুজনে মিলে ঠিক করলাম হোক অফ সিজন, যেতে তো আর কোন বাধা নেই। যা ভাবা তাই কাজ।

১৩ মার্চ শনিবার শিয়ালদহ থেকে রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চড়ে বসলাম দুজনে। বসলাম বলা ভুল রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেন, তাই বাড়ি থেকেই রাতের খাওয়া সেরে যাওয়ার জন্য, আর দুজনেরই আপার বার্থ হওয়ায় একদম লম্বা হয়ে পড়লাম। নিচে লোক সমাগম চলতে থাকল, মাঝখানে চেকার এসে টিকিট দেখে গেলেন। মার্চ মাস তাও যেন আপার বার্থে শুয়ে কেঁপে যাচ্ছিলাম। ফোনে মেসেজ করতে উত্তর এল আমার গিন্নিও ঠান্ডায় জমে যাচ্ছেন। উল্টোদিকের একজন যাত্রী আবার জ্যাকেট বার করে পরলেন। ভাবলাম মার্চ মাসেও মুর্শিদাবাদে এত ঠান্ডা পড়ে! কিন্তু আমরা তো কোন গরম পোশাক আনিনি। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল। পথে আর সেরকম কিছু ঘটনা ঘটেনি। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ফোন-এর কাঁপুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল, মেসেজ পেলাম আর একটুপরেই নামতে হবে।

ট্রেন ঠিক সময়ে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামিয়ে দিল। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঠান্ডা রয়েছে, কিন্তু কাঁপুনি নেই। নিশ্চিন্ত হলাম। যাইহোক টোটো ধরে পৌঁছে গেলাম হোটেল অন্বেষায়। দেখলাম ত্রিপোলিয়া গেট পেরিয়ে কেল্লা নিজামত এলাকায় প্রবেশ করেছি। কেল্লা নিজামত এলাকাতেই ছিল নবাব এবং তাঁদের বেগমদের প্রাসাদ। এই ত্রিপোলিয়া গেটের প্রবেশপথটি এতটাই উঁচু যে হাওদাসমেত হাতি এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারত। এর ওপরের নহবতখানা থেকে সানাইবাদকরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সানাই পরিবেশন করতেন।

হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। হোটেলটির অবস্থান খুব ভাল জায়গায়, লালবাগের প্রধান রাস্তা থেকে একটু ভেতরে যার ফলে গাড়ির কচকচিটা নেই। আবার ইমামবাড়া ও হাজারদুয়ারি একদম হাঁটা দূরত্ব এবং পেছনে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। হোটেলে ঢোকার পর হোটেলটি কেমন এবং ঘরের পজিশন ঠিকঠাক কিনা তা নিয়ে মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, বিশেষ করে আমার সহধর্মিণীর, কারণ সে নিজের দায়িত্বে বুক করেছিল ট্যুরপ্ল্যানার থেকে তথ্য নিয়ে, ঘর দেখে সেটা দূর হল। এককথায় দারুণ। হোটেলের ম্যানেজারও খুব ভালো। বললেন, রিভার-ফেসিং ঘর দিয়েছি। যদিও আমাদের ঘোরাঘুরিতে সেটা কিছুই উপভোগ করতে পারিনি, কিন্তু রাত্রে বেশ ঠান্ডা হত ঘরটা।

যে টোটো ধরে হোটেলে এলাম তার সঙ্গেই কথা বলে নিয়েছিলাম দর্শনীয় স্থানগুলো ঘোরাবার জন্য। ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ভোর ভোর-ই বের হলাম চারপাশটা দেখার জন্য। ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারি, ভাগীরথীর ঘাট, ওয়াসিফ মঞ্জিল দেখলাম ভোরের আলোয়। হাজারদুয়ারির মাঠে সকালে হাঁটতে আসেন অনেকে। আলো আর অন্ধকারে সবকিছু কত পাল্টে যায়! যে ইমামবাড়াকে রাতের অন্ধকারে টোটো থেকে দেখে ভয়ালদর্শন মনে হচ্ছিল, ভোরের আলোয় তারই স্নিগ্ধরূপ আকৃষ্ট করল। এরপর হোটেলে ফিরে একটু পেটপুজো সেরে টোটো ধরে বেড়িয়ে পড়লাম টো টো করে ঘোরবার জন্য।

কথায় বলে 'ইতিহাস ফিস ফিস কথা কয়'। আর এমন স্থানের একটু ইতিহাস বর্ণনা না করলে ভ্রমণকাহিনিটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই ভ্রমণ প্রসঙ্গ শুরু করার আগে, পিছিয়ে যাচ্ছি প্রায় তিনশ বছর। সাল তারিখের কচকচি সরিয়ে রেখে আলোকপাত করছি। কারণ এটা ভ্রমণকাহিনি, ইতিহাস ক্লাস নয় আর আমিও ইতিহাসের ছাত্র নই। এই জায়গাটির আদি নাম ছিল মকসুদাবাদ। মুর্শিদকুলি খান এখানকার নবাব নাজিম নিযুক্ত হওয়ার আগে ঢাকা ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অর্থাৎ এককথায় সুবে বাংলার রাজধানী। যদিও বাদশাহ শাহজাহানের আমলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন, রাজধানী ছিল রাজমহল-এ। পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হলে, তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মির জুমলা শাহ সুজাকে প্রথমে ১৬৫৯ সালে খাজওয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও তারপর সুদূর আরাকান প্রদেশে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পুরস্কারস্বরূপ বাংলার নতুন সুবেদার নিযুক্ত হন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ঢাকাতে। তাই বাংলার সুবেদার বসবাস করতেন ঢাকাতেই। মুর্শিদকুলি খানের জন্ম দক্ষিণ ভারতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয় এবং ভাগ্যের ফেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক সেই সময় সমগ্র দেশের অবস্থা কেমন ছিল। একদিকে দিল্লির মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে প্রথমে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর এবং পরে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অর্থব্যয় এবং লোকব্যয়ে জেরবার। অন্যদিকে তাঁর পৌত্র আজিমুশওয়ান তখন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী সুবেদার ইব্রাহিম খানের সময় থেকে বিভিন্ন সামন্ত প্রভু (অবিভক্ত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জমিদার শোভা সিংহ) ও আফগানদের (রহিম খান) নেতৃত্বে যেসব বিদ্রোহ ইতস্তত দানা বেঁধেছিল, তা কঠোর হাতে দমন করেছেন। ঠিক এইরকম সময়ে মুর্শিদকুলি খান ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে এলেন দক্ষিণ ভারত থেকে।

যে কোনও কারণেই হোক সুবেদারের সঙ্গে দেওয়ানের সম্পর্কটা ভাল ছিল না। অপরদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী মুর্শিদকুলি বুঝেছিলেন আওরঙ্গজেবের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বিরাট যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, সেই কারণে তিনি যা খাজনা আদায় হত, তা সুবেদারের হস্তে সমর্পণ না করে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিতেন দিল্লির বাদশাহর কাছে। এমনি করেই তিনি আওরঙ্গজেবের সুনজরে আসেন এবং 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ও দিল্লির সিংহাসন দখল করা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যেই বাদশাহ ফারুকশিয়র বাংলার নবাব নাজিম নিযুক্ত করেন মুর্শিদকুলি খানকে। ঢাকা থেকে এই মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসেন মুর্শিদকুলি, ১৭১৭ সালে। নিজের নামে জায়গাটির নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। তাঁর হাত ধরেই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে যাত্রা শুরু করে বাংলা। তিনি ছিলেন সুবে বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তিনি এবং তাঁর পরিবারের বাকি দুই শাসক সুজাউদ্দিন খান (মুর্শিদকুলির জামাতা) এবং সরফরাজ খান (সুজাউদ্দিনের পুত্র) রাজত্ব করেছিলেন ১৭৪০ সাল পর্যন্ত। শেষে বিহারের গভর্নর (নাজিম) আলিবর্দি খানের গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যার মধ্য দিয়েই নাসিরি বংশের শাসনের শেষ হয় এবং আফসারি বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছিল। আলিবর্দি খানের রাজত্বকাল কেটে গিয়েছিল বাংলাদেশে বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে করতেই। অপুত্রক হওয়ায় তিনি পরবর্তী নবাব নাজিম মনোনীত করে যান দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে। সিদ্ধান্তটা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং মধ্যম কন্যার পুত্র পুর্ণিয়ার নবাব সৌওকত জঙ্গের মোটেই পছন্দ হয়নি। ফলস্বরূপ শুরু হয় সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নদিয়ার পলাশীর প্রান্তরে এক অসম লড়াই-এর মধ্য দিয়ে বাংলার স্বলায়ু স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায় সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এদেশে ব্যবসা করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির সহযোগিতায় ও সেইসঙ্গে আফসারি বংশের রাজত্বকালও শেষ হয়। এই ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ঘসেটি বেগম, সিরাজের সেনাপতি মির জাফর, রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ ও তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস, জগৎশেঠ, মহতাবচাঁদ ও লর্ড ক্লাইভ এবং আড়াল থেকে মদত দেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

মির জাফর এরপর সুবে বাংলার নতুন নবাব নাজিম হলেন। শুরু হল নজাফি বংশের শাসন। কিন্তু নামেই নবাব নাজিম; শাসনভার পুরোটাই ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। শেষে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মির জাফরের জামাতা মির কাশেম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর বাংলার দেওয়ানি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। যে বাংলাকে এককালে 'Richest province of Mughal Empire' বলা হত, সেই বাংলার মানুষ ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) কোম্পানির শোষণ এবং অযোগ্য পুতুলনবাবদের শাসনকার্যে দেখল এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, বাংলার ইতিহাসে যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। এই বাংলা দিয়ে যে ইংরেজ শাসনের শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা গ্রাস করল সমগ্র ভারতকে। 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হল। এরপর ইংরেজদের তত্ত্বাবধানেই বাংলায় একের পর এক মির জাফরের বংশধররা সিংহাসনে বসেন নবাব নাজিম উপাধি নিয়ে। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র উপাধিটাই পেতেন, শাসনকার্যে তাঁদের কোন অবদান ছিল না, কেবলমাত্র দস্তখত করা ছাড়া। শেষে ১৮৮০ সালে ফেরাদুন জা (মনসুর আলি খান)-এর শাসনকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নবাব নাজিম' উপাধিটাও বিলুপ্ত করা হয়। এরপর বাকিরা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের 'নবাব' হিসেবে রাজত্ব করে গেছেন। যাইহোক, এই হল মোটামুটি মুর্শিদাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার আসা যাক ভ্রমণপ্রসঙ্গে।

পর্ব- তিন

প্রথম গন্তব্য আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ। স্থানীয়দের ভাষায় এটি 'জ্যান্ত বেগমের সমাধি'। একবার মুর্শিদকুলি খানের কন্যা আজিমুন্নিসা বেগমের কঠিন অসুখ হয়। সেটি সারানোর জন্য বড় বড় হাকিম, কবিরাজরা জ্যান্ত মনুষ্য শিশুর কলিজা খেতে বলেছিলেন। এই কাজটি করতে করতে বেগমের অসুখ সেরে গেলেও, তাঁর কলিজা খাওয়ার একটা নেশা ধরে যায়। এই খবর কানে যেতে নবাব মুর্শিদকুলি খান তাঁকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ছিলেন। এই বেগম আবার 'কলিজা খাকি বেগম' নামেও পরিচিত। কবরটি রয়েছে মসজিদের সিঁড়ির নিচে। লোকাল গাইডরা বলেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে, পর্যটকদের পদধূলিতে আজিমুন্নিসা বেগমের আত্মা শান্তি পাবে।

এরপর পথে পড়ল বাংলার ষষ্ঠ নবাব মির জাফরের আরাধনা করার মসজিদ। মসজিদটি তাঁর তৃতীয় বেগম যিনি ইতিহাসে মুন্নি বেগম নামে পরিচিত, তিনি নির্মাণ করান।

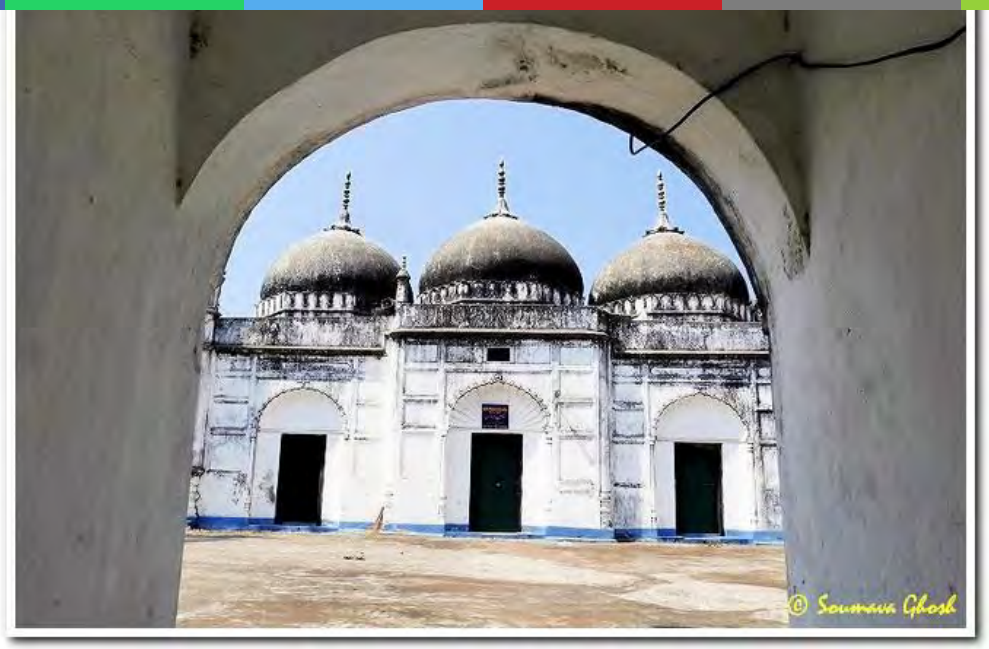

তারপর এল মির জাফরের বাড়ির দেউড়ি। এটি 'নিমকহারাম দেউড়ি' নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলে মির জাফরের বড় ছেলে মিরনের নির্দেশে মহম্মদি বেগ নবাব সিরাজকে হত্যা করে এই দেউড়িতেই ঝুলিয়ে রেখেছিল।

তার ভেতরে কিছুটা গিয়ে চোখে পড়ল লোহার গেট, যার ভেতরে মির জাফরের বর্তমান বংশধররা থাকেন। এখানে রয়েছে একটি সুদৃশ্য ইমামবাড়া। এখানে প্রবেশ ও ফোটো তোলা দুটিই নিষিদ্ধ। একসময়ের নবাবের বংশধররা এখন লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছেন। আর একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রের প্রধান ফটক। মির জাফরের পরিবারের সদস্যদের প্রায় এগারোশোটি সমাধি রয়েছে এখানে।

শুধুমাত্র শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা-র ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর তাঁকে প্রথমে এখানে সমাধিস্থ করা হলেও পরে কারবালার প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করা হয়। পর্দানশীন প্রথা মেনে বেগমদের সমাধিগুলি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যদিও বর্তমানে পাঁচিল অনেক জায়গাতেই ভেঙে পড়েছে। এছাড়াও রয়েছে মিরনের পোষা বাজপাখি ও পায়রার সমাধি। সমাধিক্ষেত্রটি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনস্থ নয়। মির জাফরের পরিবারের সদস্যরাই এর দেখভাল করেন।

এবার পাড়ি জমালাম কাঠগোলা বাগানবাড়িতে। ১৭৮০ সালে লক্ষ্মীপদ সিং ডুগার আড়াইশো বিঘে জমির ওপর এই বাড়িটি নির্মাণ করান। প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল পথের দুধারে ঘোড়সওয়ার চারটি মূর্তি - চার ভাই লক্ষ্মীপদ, জগপদ, মহীপদ ও ধনপদের। এরপর রয়েছে টিকিট কাউন্টার। প্রবেশমূল্য দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে সিংহতোরণবিশিষ্ট সুড়ঙ্গপথ।

সুড়ঙ্গটি দুশো মিটার দূরে জগৎশেঠের বাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এমনকি ভাগীরথী পর্যন্ত যাওয়া যেত এটি দিয়ে। বর্তমানে ভাগীরথীর জল ঢুকে যাওয়ায় সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে রয়েছে একটি চিড়িয়াখানা। বিভিন্নধরণের মাছ আর পাখিতে পরিপূর্ণ। এখানে রয়েছে বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর ও ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর প্রস্তরমূর্তি। বাগানবাড়িটি খুবই সুন্দর - বিভিন্ন দামী দামী আসবাবপত্রে ভর্তি। ১৮৭০ সালের পর পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল বাগানবাড়িটি। কলকাতানিবাসী লক্ষ্মীপদ সিং ডুগারের বংশধররা এটির দেখভাল করেন বর্তমানে। এর অভ্যন্তরে ফোটো তোলা বারণ। বাড়িটির সামনে রয়েছে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটি বড় জলাশয়। নানান রকমের রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে সেখানে।

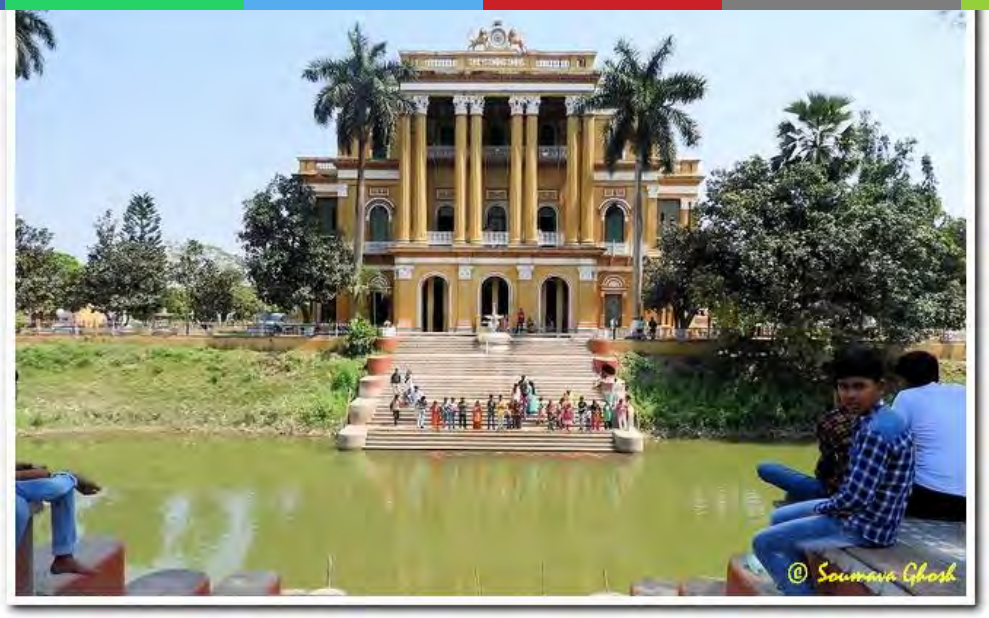

আর একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে পাথরবাঁধানো একটি মুক্ত মঞ্চ। এই মুক্ত মঞ্চটি ছিল নাচঘর, যা সে সময়ে বেলজিয়াম গ্লাস দিয়ে ঘেরা থাকত। জনশ্রুতি কলকাতা, দিল্লি, লখনউ থেকে বাঈজি আসত শেঠদের মনোরঞ্জন করতে। শোনা যায় হিরা বাঈ প্রতি সন্ধ্যায় নৃত্য পরিবেশন করতে তখনকার দিনে পাঁচহাজার টাকা করে পারিশ্রমিক নিত। আর একটু এগোলে সামনে রয়েছে শ্রী শ্রী আদিনাথজির মন্দির। মরসুম না হওয়ায় গোলাপবাগানের সৌন্দর্যটি তেমনভাবে উপভোগ করা যায়নি। তবে জায়গাটির নাম নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এখানে কাঠের গোলা বা আরত ছিল আবার কারও মতে সুন্দর কাঠগোলাপের বাগান ছিল, যা থেকে এর নাম হয়েছিল কাঠগোলা।
কাঠগোলা দেখে পৌঁছলাম জগৎশেঠের বাড়ি। এই সেই বাড়ি যেখান থেকে একসময় দেশের নবাব, বাদশাহ এমনকি বিদেশি বণিকরাও অর্থসাহায্য পেতেন। এইকারণে দিল্লির বাদশাহ-এর থেকে এনারা 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। অনেকের মতে সেই সময় জগৎশেঠের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের সব ক'টি ব্যাঙ্কের থেকে বহুগুণ বেশি।

বাড়িটিতে পা দিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করে কোম্পানির টাকা করলে এই বাড়ির প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ইতিহাসের কী নির্মম বিচার! যাঁরা একসময় ইংরেজদের মদত দিয়ে সিরাজকে গদিচ্যুত করেছিলেন; তাঁরাই ক্রমশ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে শাসনব্যবস্থা থেকে ব্রাত্য হয়ে যেতে থাকলেন। জগৎশেঠের বাড়ির মধ্যে রয়েছে কাঠগোলা বাগানবাড়িতে দেখা সুড়ঙ্গের অপর মুখটি। এখানেও ছবি তোলার অনুমতি নেই। বর্তমানে এই বাড়িটি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে রয়েছে জগৎশেঠের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। এছাড়া রয়েছে পরিবারের আরাধ্য পার্সি মন্দির।

চলে আসেন এই বাংলায়। এই সময় দিল্লির প্রদীপ প্রায় নিভু নিভু, যত রোশনাই এই বাংলায়। দেওয়ানী সিংহ এখানে এসে ব্যবসা শুরু করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর পুত্র দেবী সিংহ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের এক জন সামান্য কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও অসামান্য কর্মদক্ষতার জন্য অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ক্লাইভের সুনজরে পড়েন। সিংহ পরিবারের সুদিনের সূত্রপাত হতে থাকে। হেস্টিংসের বদান্যতায় বাংলা ও বিহারের কিছু পরগনা লাভ করেন দেবী সিংহ ও তাঁর ভাই। একদিকে ১৭৭৩ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে দেবী সিংহ তার প্রধান নির্বাচিত হন, অপরদিকে তাঁকে রাজস্ব দফতরের দেওয়ান করা হয়। এইসময় হেস্টিংস পুরোনো জমিদারিপ্রথার পরিবর্তে চালু করেন পাঁচ বছরের ইজারাদারি প্রথা। পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে যথাসম্ভর রোজগার করে নেওয়ার তাগিদে প্রজাদের ওপর প্রচণ্ডভাবে শোষণ করত ইজারাদারেরা, যা ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারকেও হার মানাত। এরকমই একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন এই দেবী সিংহ। ১৭৭৬ সাল নাগাদ তিনি নশিপুর রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন। শোনা যায় প্রজারা খাজনা দিতে না পারলে তাদের জোর করে তুলে এনে এই রাজবাড়িতে অকথ্য অত্যাচার করা হত, এমনকি ফাঁসিও দেওয়া হত। এই অত্যাচার থেকে মেয়েরাও বাদ যেত না। অত্যাচারের মাত্রা এতই বেড়ে গেছিল যে সেই সময় রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়। কোম্পানির কর্মকর্তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। ফলস্বরূপ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয় তাঁকে। কোম্পানি বাহাদুর নিজেদের দোষ লাঘব করতে এরপর দেবী সিংহকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করে।

পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়িটির করুণ অবস্থা হলে দেবী সিংহের উত্তরপুরুষ মহারাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুর ১৮৫৬ সালে অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের এক বছর আগে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করান। এটিও বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে সংরক্ষিত। এখানে তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও রয়েছে শিল্পী পঞ্চানন বাবুর কিছু অসামান্য চিত্রকর্ম। রয়েছে আট ফুট উচ্চতার গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। এছাড়াও নাটমন্দির, হনুমান মন্দির এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

এবার হাজির হলাম জাফরাগঞ্জের শ্রী রঘুনাথজির মন্দিরে, যা আবার নশিপুর আখড়া নামেও পরিচিত। এটি রামানুজ সম্প্রদায়ের মহন্ত ভগবান দাসের আশ্রম।

মির জাফর মহন্ত লছমন দাসকে এই জমিটি দান করেন। লছমন দাস উত্তরাখণ্ড থেকে একটি শিবলিঙ্গ এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে রুপোর হাতি, সোনার রথের সঙ্গে রয়েছে আশি টাকা মূল্যের গাড়ি। প্রধান মন্দিরটির মাথায় লাল ও সবুজ রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পলাশীর যুদ্ধ। লাল দিয়ে কোম্পানির সেনা ও সবুজ রঙের মাধ্যমে নবাবের বাহিনীকে দেখানো হয়েছে। শুনলাম এখানে আষাঢ় মাসে রথ, শ্রাবণ মাসে ঝুলন ও কার্তিকে রাস উৎসব হয়। আগে কলকাতার শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করলেও বর্তমানে অর্থাভাবের জন্য স্থানীয় শিল্পীদের দিয়েই অনুষ্ঠান করানো হয়ে থাকে।

পর্ব - চার

এরপর পথে পড়ল ফুটি বা ফৌটি মসজিদ। বাংলার তৃতীয় নবাব মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্র সরফরজ খান যে এক বছর (১৭৩৯-৪০) সুবে বাংলার নবাব নাজিম ছিলেন, তার মধ্যে এটি নির্মাণ করান। শোনা যায় এই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল একদিনে। বর্তমানে এটির হাল খুবই শোচনীয়।

সরফরজ খান মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বড়ই উপেক্ষিত শাসক, এমনকি মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে কোথাও তাঁর সমাধির উল্লেখ নেই। ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হলে, আলিবর্দি খান তাঁর পরিবারকে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেন। তারপর থেকেই এই নবাবের চিহ্ন বাংলার ইতিহাস থেকে মুছে যায়। এই মসজিদটি এখনও সরফরজ খানের শাসনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তবে বেশিদিন এই ভার বহন করতে পারবে কিনা সন্দেহ! হয়ত এরপর সরফরজ খানের চিহ্ন মুর্শিদাবাদ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।
ফুটি মসজিদ পেরিয়ে এগোনোর সময় টোটোর চালক দেখাল পর পর রেশমগুটি শুকনো করার জায়গা। রোদের মধ্যে খোলা মাঠে হাজারে হাজারে রেশমগুটি শুকোনো হচ্ছে কাঠের জালের ওপর। মুর্শিদাবাদ সিল্ক-এর নাম সবাই জানে। এই হল তার উৎস।

দৌহিত্রের মসজিদ আগেই পথে পড়েছিল। এইবার পা রাখলাম মাতামহের নির্মিত মসজিদে। ঠিকই আন্দাজ করেছেন পাঠকরা। এই হল মুর্শিদকুলি খান নির্মিত মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম স্থাপত্য কাটরা মসজিদ। ১৭২৩-২৪ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল মসজিদটি। এর চারধারে রয়েছে চারটি মিনার। দুটি এখনও অবশিষ্ট থাকলেও বাকি দুটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। সিঁড়ির নিচেই শায়িত রয়েছেন নগরজনক। তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছে ছিল, যারা তাঁর সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসবেন তাঁদের পদধূলিতে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করবে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই প্রথমে চোখে পড়ে একটি বড়

সিঁড়ির অপরপ্রান্তে রয়েছে মসজিদের প্রবেশপথ। মসজিদটিতে আছে পাঁচটি দরজা ও পাঁচটি গম্বুজ। দরজাগুলোর উল্টোদিকে রয়েছে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকার কুলঙ্গি বা 'মিহরাব', যা মক্কার দিক নির্দেশ করে। এই মসজিদটি সেই সময়ে ইসলামিক শিক্ষার পীঠস্থান বা মাদ্রাসা রূপে গণ্য হত। চারপাশে সাতশোটি ঘর আছে, সেগুলো কোরান পাঠকদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত। প্রাঙ্গণের একধারে রয়েছে একটি শিব মন্দির। কে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কাটরা মসজিদ দেখে পৌঁছলাম জাহানকোষা কামান দেখতে। দিল্লির বাদশাহ যখন শাহজাহান তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন ইসলাম খান (১৬৩৫-৩৯)। তাঁর আমলে ঢাকার জনৈক কারিগর জনার্দন কর্মকার অষ্টধাতু দিয়ে এই কামানটি নির্মাণ করেন। 'জাহান কোষা' শব্দের অর্থ 'পৃথিবী ধ্বংসকারী'।

এটি বর্তমানে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কাটরা মসজিদের দক্ষিণ পূর্বে তোপখানায় এটি অবস্থিত। এর ওজন সাত টন। লম্বায় সতেরো ফুট ছয় ইঞ্চি এবং চওড়ায় তিন ফুট। শোনা যায় এটি থেকে একবার গোলা ছুঁড়তে সতেরো কিলোগ্রাম বারুদ প্রয়োজন হত।

বিভিন্ন বিদেশি বণিকসম্প্রদায় যেমন ইংরেজ, ডাচ, ফরাসিরা এখানেই তাদের প্রথম বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। কলকাতা প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে পর্যন্ত কাশিমবাজার বিদেশি বণিকদের আনাগোনায় সর্বদা মুখরিত হয়ে থাকত। কাশিমবাজার রাজবাড়ি পৌঁছনোর আগে পথে পড়ল ডাচ কবরখানা। ১৬৬৬ সালে ডাচরা কাশিমবাজারে কুঠি নির্মাণ করে। ১৭২১ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে মোট সাতচল্লিশ জন ডাচ কর্মচারীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এই কবরখানায়। এরপর ইংরেজরা ডাচ কুঠি অধিগ্রহণ করলে ডাচরা কাশিমবাজার পরিত্যাগ করে। প্রায় দুশো-আড়াইশো বছর আগের সমাধিক্ষেত্রটি রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার অভিমান বুকে নিয়ে আজও দণ্ডায়মান।

কাশিমবাজারে দুটি রাজবাড়ি। আমরা প্রথম গেলাম কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ি। সতেরো শতকের মাঝামাঝি কৃষ্ণকান্ত নন্দীর হাত ধরে এই রাজবাড়ির উত্থান। মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংসকে সিরাজের রোষ থেকে বাঁচিয়ে গোপনে মুর্শিদাবাদ ছাড়তে সাহায্য করেছিলেন তিনি। হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিল্লির বাদশাহর কাছে কৃষ্ণকান্তের উত্তরপুরুষদের 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। এই বংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে একটি ছোট বিশেষণই যথেষ্ট মনে হয়, তা হল 'দাতাকর্ণ'। বাড়িটির বর্তমানে খুবই খারাপ অবস্থা। প্রবেশ নিষেধ। আমরা টোটো থেকেই দেখলাম।

তারপর এলাম ছোট রাজবাড়ি। ১৭০০ সাল নাগাদ অযোধ্যারাম রায় পিরজপুর জেলা (অধুনা বাংলাদেশে) থেকে কাশিমবাজার এসে রেশমের ব্যবসা শুরু করেন। তিনিই এই কাশিমবাজার ছোট রাজবংশের জনক। বর্তমানে এই বাড়িটি

এর কর্ণধার) কলকাতায় বসবাস করেন। বাড়িটিতে একদিকে রয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ অন্যদিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা থেকে সবাই আসেন এবং খুব ধুমধামের সঙ্গে আড়াইশো বছরের প্রাচীন পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি দেখে আমরা পাড়ি জমালাম পাতালেশ্বর শিব দেখতে। পথে দাঁড়ানো হল ওল্ড ইংলিশ সিমেটারিতে। অনেকটা কলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারির মতো হলেও আকারে অনেক ছোট। এখানে অল্প কিছু ইংরেজদের সমাধি থাকলেও প্রধান আকর্ষণ বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা স্ত্রী মেরি হেস্টিংস ও কন্যা এলিজাবেথের সমাধি দুটি। যদিও বর্তমানে সমাধি দুটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ফলকগুলি বেশ অস্পষ্ট। হেস্টিংস সাহেব বাংলার গভর্নর হিসেবে কাজ শুরু করার আগে এই মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মারা গেলে এখানেই সমাহিত করা হয়।
বলা হয়নি,কাশিমবাজারেই মধ্যাহ্নভোজনটি সেরে নিয়েছিলাম। এইবার পাতালেশ্বর শিব মন্দিরে পৌঁছলাম। এখানে শিবলিঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অন্য মন্দিরের মতন শিবলিঙ্গটি বেদির ওপর বসানো নয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করলে দেখা যায় মন্দিরের গর্ভগৃহে মাটির গর্তে শিবলিঙ্গটি রয়েছে। শিবরাত্রির পর পরই গেছিলাম বলে দেখা গেল মন্দিরটি বেশ সাজানো। মঞ্চে গান হচ্ছে আবার সেই সঙ্গে প্রচুর ভক্ত সমাগমও হচ্ছে।

গলদঘর্ম অবস্থা। সঙ্গের জল প্রায় শেষ। তাই শিব দর্শন করে আমরা দুজন ঠান্ডা পানীয়ের স্মরণাপন্ন হলাম। গলা ভেজাতে আরাম হল। 'বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে' বেড়াতে এসে তো আর বিশ্রাম নেওয়া যায় না। তাই রোদ উপেক্ষা করেই আমরা এগলাম। চরৈবেতি!

আজকের মতো শেষ গন্তব্য মতিঝিল প্রাসাদ। এখান থেকে মতিঝিল বেশ কিছুটা দূর। তাই যেতে যেতে পাঠকবন্ধুদের আমাদের ঘোরার প্ল্যানটা জানাই। এত তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘোরা শুরু করলাম যে এসব কিছুই বলা হয়নি। আগেই বলেছি হঠাৎ করে আসা। তাই মাত্র তিন দিন ছুটি নিয়ে আসা হয়েছে ১৫ থেকে ১৭। ১৭ ফেরার ট্রেন। মাঝখানে উপরি পাওনা ১৪ তারিখের রবিবার। পরিকল্পনাটা এইরকম, ১৪ তারিখ এদিকটা পুরো ঘোরা আর ১৫ তারিখ ভাগীরথী পেরিয়ে অন্যদিকটা। ১৬ তারিখটা রাখা থাকল লালবাগের বাকি দ্রষ্টব্য স্থানগুলির জন্য। ওমা! সত্যিই অনেকটা দূর। আসতে আসতে আমাদের টোটোর ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেল। আরেকটা টোটোতে চেপে মতিঝিল এসে নামলাম।

মতিঝিল প্রাসাদটি নওয়াজেস মহম্মদ খান তাঁর পত্নী মেহেরুন্নিসার জন্য তৈরি করান। এই নওয়াজেস মহম্মদ খান ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। আলিবর্দি খান বাংলার নবাব নাজিম হয়ে তাঁকে শুধুমাত্র ঢাকা বা তৎকালীন জাহাঙ্গীর নগরের ছোট নবাবই নিযুক্ত করেছিলেন তাই নয়, নিজের বড় মেয়ে মেহেরুন্নিসার সঙ্গে বিবাহও দেন। এই মেহেরুন্নিসাই ইতিহাসে ঘষেটি বেগম নামে পরিচিত। বর্তমানে প্রাসাদটি আর অবশিষ্ট নেই। যে ঝিল বা জলাশয়ের পাড়ে এই প্রাসাদটি ছিল তা দেখতে অবিকল ঘোড়ার ক্ষুরের মত, তাই মনে করা হয় এটি ভাগীরথীর অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। প্রাসাদ না থাকলেও রয়ে গেছে মতিঝিল মসজিদ, নওয়াজেস মহম্মদের সমাধি আর একটি দরজা-জানলা বিহীন গুপ্ত ঘর। এই ঘরটিতে কী ছিল তা আজও অজানা। কথিত আছে পলাশীর যুদ্ধের পর এক ইংরেজ কর্মচারী কামান দেগে এটি ভাঙ্গতে গেলে সে নিজেই মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু ঘরটি অটুটই থেকে যায়। কত কালের ইতিহাস এইভাবে বুকে চেপে রেখেছে ঘরটি ভেবে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। যে প্রাসাদটি এককালে ছিল পলাশীর ষড়যন্ত্রের প্রধান আঁতুড়ঘর, তা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ঘষেটি বেগম ও নওয়াজেস মহম্মদ নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁরা সিরাজের ভাই একরামউদ্দৌলাকে দত্তক নিয়েছিলেন। নওয়াজেস মহম্মদ দক্ষ প্রশাসক হওয়ায় এবং আলিবর্দি খান অপুত্রক হওয়ায় ঘষেটি বেগমের আশা ছিল আলিবর্দির পর নওয়াজেস মহম্মদ হবেন বাংলার নবাব। সেটি না হলেও তাঁদের দত্তক পুত্র সেই স্থান অভিষিক্ত করবে। কিন্তু আলিবর্দি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজকে নতুন নবাব মনোনীত করে যান। এর মধ্যে অবশ্য গুটি বসন্তে একরামউদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছে। আলিবর্দি খানের এই প্রস্তাবটি ঘষেটি বেগমের সবচেয়ে আপত্তির কারণ ছিল। এরপর সিরাজ ১৭৫৬ সালে কলকাতার দখল নেন। ১৭৫৭ সালে সিরাজ বাহিনীর হাতে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির পতন হলে, তিনি মতিঝিল প্রাসাদ আক্রমণ করেন ও ঘষেটি বেগমকে বন্দী করেন। অবশেষে আসে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। যে দিন সিরাজ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এই মতিঝিল প্রাসাদ থেকেই নদীয়া জেলার পলাশীর প্রান্তরের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। শোনা যায় এখানে মুক্তোর চাষ হত, তার থেকেই এই প্রাসাদটির নাম হয়েছিল মতিঝিল। সিরাজ নিজের জন্য অনুরূপ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে নাম রাখেন হীরাঝিল। যদিও সেটাও কালের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। এই মতিঝিল প্রাসাদের জায়গায় বর্তমানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ প্রকৃতি তীর্থ। যার মধ্যে আলো ও ধ্বনির মাধ্যমে পলাশীর ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের নির্মম পরিণতিটা দেখান হয়। এছাড়া বোটিং, ফোয়ারা ইত্যাদি নানা রকম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। আজকের মত ঘোরা শেষ এবার হোটেলে ফেরার পালা।

মুর্শিদাবাদ বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নবাবি আমল আর মুর্শিদাবাদ সিল্ক। কিন্তু আমরা বাঙালি তাই শুধু পায়ের তলায় সর্ষে বলা ভুল। জিভেও আছে মিষ্টির স্বাদ। খুঁজে খুঁজে মিষ্টি খাওয়াইতো বাঙালির কাজ। তাই মুর্শিদাবাদ যাব

সাধারণত কালোজাম একটু মোটা রসে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু ছানাবড়া সাঁতার কাটতে চায় পাতলা রসে। ছানাবড়ার ভেতরটা ফাঁপা হওয়ায় ওখানে একটু রস লুকিয়ে থাকে। অসাবধানে কামড় দিলে গা ভিজে যেতে পারে। তাই মা চামুণ্ডার রক্তবীজকে মারার মত জিভের ওপর বসিয়ে কামড় দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর আসি পোস্তর মিষ্টিতে। পাতলা ক্ষীরের আস্তরণের ওপর রয়েছে পোস্তর একটা পাতলা চাদর। আর ভেতরে লুকিয়ে আছে গোলাকার বল। যা আবার রসসিক্ত। আমরা ছানাবড়ার কথা বলায় টোটোর দাদা আমাদের অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে গেল। দুরকম মিষ্টিই গলাধঃকরণ করে জল খেয়ে টোটোয় চড়ে বসলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। ঘরে এসে ফ্রেশ হলাম। হোটেল অন্বেষার উল্টোদিকেই একটি গুমটি দোকান ছিল। ওখান থেকেই আমরা রাতের আহার, সকালের চা এবং জলখাবার সম্পন্ন করতাম। প্রথম দিন আমরা রুটি, তড়কা ও ডিমের কারি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। গিন্নীর ইচ্ছে ছিল চিকেন। বললাম, কাল হবে।

~ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য~

~ মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেক. সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

নোর আমন্ত্রণ রইল =

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক

মৃণাল মণ্ডল

~ গঙ্গোত্রী-গোমুখ ট্রেকরুট ম্যাপ ~ গঙ্গোত্রী-গোমুখের আরও ছবি ~

গোমুখ অভিযান :

গঙ্গোত্রী পর্ব

২০১৭ সাল। মে মাস। সাধারণত আমাদের মে মাসে বড় কোনও অভিযান হয় না। অন্তত আজ অবধি হয়নি। কিন্তু এবার তা আর হল না। নতুন জায়গা। নতুন দল। আমি আর অসীমা আগের দলের সদস্য। এবার আমার সঙ্গে পরিকল্পনা শুরু হল সন্দীপদার। সন্দীপদা প্রস্তাব দিল উত্তরাখণ্ড ট্রেকের। অনেকগুলো ট্রেক রুট ভাবা হল। প্রথমে ভাবা হল হর্-কি-দুন। তারপর আলোচনা পর্যালোচনা চলল দিনের পর দিন। শুরু হল পড়াশুনা। খোঁজখবর নেওয়া। চেনা-অচেনা সবার কাছে। এমনকি ট্যুর এজেন্সির থেকেও। সঙ্গে চলল দলগত আলোচনা। কোথায় যাব, কারা কারা যেতে চায় এইসব জরুরি বিষয়ে। শুরু হল ছোট ছোট মিটিং। হোয়াটস্অ্যাপে গ্রুপ বানিয়ে প্রায়ই সেসব আলোচনা আস্তে আস্তে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে উসকে দিতে লাগল প্রতিদিন। প্রত্যেকটি আলোচনার পরেই যেন অবচেতনে পৌঁছে যেতে লাগলাম সেই অচেনা অদেখা রাজ্যে। কতবার যে মনে গড়ে উঠল কাল্পনিক এক সফর আর তার হৃদয়গাহ্য অপার্থিব সৌন্দর্য তার হিসেব রইল না। দিনে একবার অন্তত আমাদের উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছিল কল্পনার অবয়বে।

সন্দীপদা এই পরিকল্পনায় আক্ষরিক অর্থেই অগ্রজের ভূমিকা নিচ্ছিল। ম্যাপ ধরে, দূরত্ব মেপে, রুট ঠিক করে, যাওয়া আসার পথ নির্ণয় করে আলোচনা এগোল। আর আমাদের হর-কি-দুন হারিয়ে গিয়ে এবার আলোচনায় চারধামের জায়গা হল পাকাপাকি ভাবে। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী (সঙ্গে গোমুখ), কেদারনাথ আর বদ্রীনাথ।

দলও ক্রমশ: ভারি হতে থাকল। অতনু আর রাখী সম্মতি জানাল একবাক্যে। ওদের ছুটি পাওয়ার সমস্যা সত্ত্বেও। আর সবথেকে বড় কথা ট্রেকিং-এর পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও। সোমাঞ্জন না-হ্যাঁ, না-হ্যাঁ করতে করতে রাজি হল। সন্দীপদা আর সোমাঞ্জনের পরিচিত একজন প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং আরও একজন যেতে রাজি হল। আর সেই সঙ্গে এগোল পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা পর্ব। মজার ব্যাপার হল যে এর মধ্যে সন্দীপদার বিয়ের ঠিক হল। মে মাসের আট তারিখ আমার আর অতনুর বান্ধবী অনসূয়ার সঙ্গে। আর আরও মজার ব্যাপার অত তাড়াতাড়ি বিয়ের তারিখ ঠিক করার পিছনে দায়ীও হয়ে রইল আমাদের উত্তরাখণ্ড পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত বিয়েতে অন্যতম একটা শর্তই ছিল, "এই ট্রেক করতে দিতে হবে, বাধা দিলে চলবে না।"

আমি আর সন্দীপদা মিলে টিকিট কাটার দায়িত্ব নিলাম। বাঙালিদের বেড়ানোর ভিড়ে টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত টিকিট কাটা হল। যাওয়ার জন্য দুটো ট্রেনে ফেরার দুটো ট্রেনে (ওয়েটিং টিকিট ও আর.এ. সি পাওয়া গেছিল তাই। পরে কনফার্ম হবে এই আশায়)।

ওদিকে সন্দীপদার বিয়েও হল ধুমধাম করে। কবজি ডুবিয়ে ভুরিভোজও করে এলাম যথারীতি।

ভোজ সেরে এসে বুঝলাম ভোজবাজির মতো আমাদের যমুনোত্রী উবে গেল। আর সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের ট্যুরের এক সদস্যকে। আবার যোগও দিল একজন। সেই যোগ দেওয়ার মজার ব্যাপারটায় পরে আসছি।

ট্যুর প্ল্যানিংটা পরিবর্তন হল। যমুনোত্রী চলে গেল বাতিলের খাতায়। তার জায়গায় যুক্ত হল তুঙ্গনাথ ও আউলি। এটাই শেষপর্যন্ত ঠিক হল। চূড়ান্ত অভিযানের রূপরেখা দাঁড়াল এইরকম - প্রথমে হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী। তারপর পদব্রজে গোমুখ। সেখান থেকে গৌরীকুণ্ড। এরপর পদব্রজে কেদার। তারপর চোপতা। সেখান থেকে পদব্রজে তুঙ্গনাথ হয়ে চন্দ্রশিলা। চন্দ্রশিলা থেকে বদ্রীনাথ হয়ে মানাগ্রাম। তারপর জসিমঠ। সেখান থেকে রোপওয়েতে আউলি। শেষে হরিদ্বার প্রত্যাবর্তন।

সেইমতো এগারো দিনের জন্য মন্দাকিনী ট্রাভেলস (হরিদ্বার-এর) থেকে গাড়ি বুক করা হল অগ্রিম পাঠিয়ে (প্রসঙ্গত বলে রাখি যাঁরা হরিদ্বার থেকে কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ি খুঁজবেন তাঁরা মন্দাকিনী থেকে নেবেন না। কারণ এরা কথা সবসময় ঠিক রাখতে পারে না। যেটা আমরা অন্য আরেকবারের উত্তরাখণ্ড সফরে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম)।

যাই হোক, আবার ফেরত আসি দলগঠনের গল্পে। সন্দীপদার পরিচিত যে প্রধান শিক্ষক সেই অভিজিৎদা শেষপর্যন্ত রাজি

রইলেন। কিন্তু আরেকজন যিনি যাবেন বলেছিলেন তিনি ইস্তফা ঘোষণা করলেন। আরও এক মজার ব্যাপার ঘটল। যার প্রসঙ্গ আগে বলতে গিয়েও বলিনি। এবার সেই প্রসঙ্গ বলা যাক।

অনসূয়া অর্থাৎ আমাদের বান্ধবী আর সন্দীপদার সদ্যবিবাহিতা সহধর্মিণী হঠাৎ বিদ্রোহ শুরু করল দাদার সঙ্গে। প্রথমে অভিযোগ। তারপর অনুযোগ, শেষটায় অভিমান। তাতেও কাজ না হওয়ায় আমার শরণাপন্ন হল। সে এক হাস্যস্পদ অভিযোগ, "দ্যাখ্, তোদের দাদা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না।" আর দাদার কথা, "ও পারবে না।"

এরপর শুরু হল দাদাকে বোঝানো আর রাজি করানোর পর্ব। শেষটায় দাদা রাজি হল। সদ্যবিবাহিত (দুসপ্তার বিয়ে হওয়া) দম্পতির হানিমুন ট্রেকও হবে তাহলে। অন্তিমদলও রূপরেখা পেল। সন্দীপদা, অনসূয়া, অতনু, রাখী, সোমাঞ্জন, অভিজিৎদা, অসীমা আর আমি।

দল হল। জায়গাও নির্বাচিত। প্রত্যেকদিন ট্রেনের টিকিটের দিকে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে রইলাম কনফার্মেশানের জন্য। অবশেষে টিকিট কনফার্ম হল - যাওয়া উপাসনা আর ফেরা কুম্ভতে। এবার চাতকের মত চেয়ে থাকলাম যাওয়ার দিনটার অপেক্ষাতে।

এইবেলা আসল কাজটা সেরে রাখি। তা হল জায়গার ইতিহাস ও ভূগোল বর্ণনা। কারণ কোথাও যাওয়ার থাকলে সেই জায়গা নিয়ে যদি একটু পড়াশুনা করে নেওয়া যায় তবে ফেলুদার ভাষায় "জায়গার সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে সহজ হয়, তখন অচেনা জায়গাও আর ঠিক অচেনা লাগে না" আর ইতিহাসের মধ্যে থাকে এক রোমহর্ষক উপলব্ধি।

খুব ছোটবেলায় পড়েছিলাম, গঙ্গানদীর উৎপত্তি হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে। পড়েছিলাম নয় বলা ভালো মুখস্থ করেছিলাম। এবার তা চাক্ষুষ দেখব ভেবেই অনেকখানি আপ্লুত ছিলাম মনে মনে। ভূগোলের সেই মুখস্থবিদ্যার চক্ষুকর্ণে বিবাদভঞ্জন হবে, এই ভেবে।

গঙ্গোত্রী আসলে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার একটা হিমবাহ অঞ্চল। ঠিক তিব্বতের সীমানা বরাবর। হিমবাহটি লম্বায় মোটামুটি ৩০ কিমি এবং চওড়ায় ২ থেকে ৪ কিমি। এই হিমবাহের অনেকগুলি চূড়া আছে (শিবলিং, থালয় সাগর, মেরু এবং তৃতীয় ভাগীরথী) যেগুলি পর্বতারোহীদের কাছে আকর্ষণীয়। হিমবাহটি চৌখাম্বার নিচের Cirque (ফরাসি শব্দ, যার অর্থ সার্কাস, আসলে হিমবাহ গলে একটা প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটার গোছের অঞ্চল তৈরি হলে তাকে cirque বলে। যা অবতল উপত্যকার মত দেখতে) থেকে প্রবাহিত। হিমবাহের শেষ অংশ অর্থাৎ পাদভূমি অনেকটা গরুর মুখের মত দেখতে একটা গুহার সৃষ্টি করেছে। তাই তার নাম গোমুখ। এই গোমুখ গঙ্গোত্রী শহর থেকে ১৯ কিমি দূরে আর শিবলিং-এর পাদদেশে অবস্থিত, সেটা আবার তপোবনের বিখ্যাত তৃণভূমি ও উপত্যকা থেকে সাড়ে চার কিমি দূরে।

এবার আসি ইতিহাসের কথায়। পুরাণমতে, হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার খোঁজ করতে করতে এক মেষপালক গঙ্গোত্রী হিমবাহের কাছে পৌঁছায় আর সেখানে সে গরুর মুখের মত গুহা দেখে অবাক হয়ে তার নামকরণ করে গোমুখ। পরবর্তীকালে যা সাধুসন্ত, পুরোহিত, পর্বতারোহী, ভ্রমণ উৎসুক সবার কাছে এক পবিত্র পূজার ও দর্শনীয় স্থান হয়ে ওঠে। কথিত আছে পাপী মন নিয়ে যদি কেউ গোমুখ দর্শনে যায় তবে তার আত্মা নরকের আগুনে জ্বলবে আর তার পার্থিব শরীরের ভয়াল ও নারকীয় ভৌতিক দর্শন হবে মুহুর্মুহু।

আর সংক্ষেপে ভূগোল হল, গঙ্গোত্রী শহর থেকে ৯ কিমি দূরে চিরবাসা, সেখান থেকে ৭ কিমি দূরে ভোজবাসা আর তারও সাড়ে ৩ কিমি দূরে গোমুখ গুহা।

অভিযানের দিন গোনার ফাঁকে আয়োজন করা হল এক দলগত সমবেত আলোচনার। উপস্থিত হলাম সন্দীপদার বাড়িতে। অভিজিৎদা বাদে বাকি সবাই। এক সান্ধ্য আসর জমে উঠল আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া, অভিযানের হালহকিকৎ আলোচনায়। সন্দীপদা নিজের হাতে মাংস রান্না করে খাওয়াল। আলোচনা হল কী কী নিতে হবে তা নিয়েও। কারণ, আমি আর অসীমা একসঙ্গে ট্রেক করি। সন্দীপদা অন্যদলের সঙ্গে বেরোয়। বাকিদের এটা প্রথম ট্রেকিং হতে চলেছিল। অসীমা আর সন্দীপদা ভালো ট্রেকার। অভিজিৎদার হাঁটার অভ্যেস ছিল। অতনু হাঁটব হাঁটব করেও পাঁজি দেখে দিন পায়নি, হাঁটার অভ্যেস করার। সোমাঞ্জনের প্রস্তুতি জানা ছিল না। তবে সোমাঞ্জন ও অতনু শেষ অবধি দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। আর মেয়েরা যারা প্রথমবারের জন্য ট্রেক করছিল (রাখী ও অনসূয়া), তারাও অসাধারণভাবে সমস্ত অভিযান শেষ করেছিল।

যাই হোক অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামের ফর্দ ও ওষুধের ব্যাপার জানিয়ে দেওয়া হল। আর রেশনের (ড্রাই ফ্রুট ও অন্যান্য খাবারদাবার) দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল।

আবার শুরু হল প্রহর গোনার পর্ব। সকলে নিজের কাজের জগতে রইল বটে কিন্তু মন পড়ে রইল অভিযানের আশায় ও উত্তেজনায়।

অবশেষে এল কাঙ্খিত সেই দিন। সবাই আগের থেকে ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ২১ তারিখ দুপুর সাড়ে তিনটেতে হাওড়া স্টেশনে জড়ো হলাম। সন্দীপদা, অনসূয়া, অভিজিৎদা আর সোমাঞ্জন আগেই পৌঁছে গেছিল। আমি, অসীমা, অতনু, রাখী একসঙ্গে পৌঁছলাম।

১২৩৬৯ কুম্ভ এক্সপ্রেস দুপুর একটায় ছাড়ার কথা হাওড়া থেকে। ছাড়ল প্রায় তিন ঘন্টা দেরি করে। উৎফুল্ল হয়ে অভিযান শুরু করলাম 'জয় ভোলেনাথ' ধ্বনিসহযোগে। আমাদের ছটা সিট একসঙ্গে আর বাকি দুটো আলাদা জায়গায় পড়েছিল। সোমাঞ্জন আর অভিজিৎদা সেই দুটো আলাদা সিটে নিজেদের জায়গা করে নিল। হইহুল্লোড় আড্ডা হল কিছুক্ষণ, সকলের বাড়িতে যাত্রাশুরুর খবর ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার পর। তারপর যে যার আসন দখল করে লম্বা হলাম। পরেরদিন বাড়ি থেকে আনা খাবারদাবার (যেমন অসীমার বাড়ি থেকে আসা লুচি, সুজির হালুয়া এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) ও স্টেশনের আর ট্রেনের খাবার দিয়ে যথাক্রমে টিফিন মধ্যাহ্নভোজন আর রাতের খাবার সারা হল। আর গোটা দিন জুড়ে চলল আড্ডা, ডাম্ব-শ্যারাড, গল্প, গানের মজলিস আরো কত কী! এরকমভাবে গোটা একটা দিন ট্রেনে কাটিয়ে ফেললাম অবলীলায়। উপাসনা পৌঁছানোর কথা ছিল ২৩ মে বিকেল সোয়া ৪-টেতে হরিদ্বারে। মোট ১৫০৬ কিমির সফরের এই যাত্রা; হাওড়া থেকে হরিদ্বারের পথে। ট্রেন পৌঁছাল দেরি করে। স্টেশন থেকে টো-টো ভাড়া করে গৌ-ঘাটের পাড়ে নামলাম। তারপর ব্রিজ টপকে হেঁটে চলে গেলাম আনন্দনিবাসে। নিচে একটা ঘর নিয়ে যে যার মত একটু বিশ্রাম ও ফ্রেশ হতে গেল। আনন্দনিবাসের কোল ঘেঁষে গঙ্গাদেবী স্বয়ং তখন আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাঁর সেই উৎফুল্ল তরঙ্গ আপনবেগে ঘরের বাইরে সিঁড়ির ধাপে এসে আলাপ জমাতে চাইছে।

আমি আর সন্দীপদা বের হলাম। আনন্দনিবাসের সামনেই মন্দাকিনী ট্রাভেলস-এর একটা অফিস। আমাদের গন্তব্য, পরিকল্পনা সব আবার ঝালিয়ে নিলাম। কপালে একটা ট্যাভেরা জুটল। ড্রাইভার মাঝবয়সি। নাম মোমিন। দ্বিতীয় প্রস্থের

অগ্রিম দিয়ে কাগজপত্রের কাজ মিটিয়ে নতুন দাদা-বৌদির হোটেলে খাওয়া সেরে আনন্দনিবাস ফিরলাম। বিকেল আর সন্ধ্যেটা গঙ্গার পাড়ে, হরিদ্বার বাজারে টহল দিতে কেটে গেল। তারপর লস্যির দোকান আর পুরনো দাদা-বৌদির দোকানে রাতের খাবার সেরে আনন্দনিবাসে ফিরলাম। রাতে নিবাসের ধাপে বসে আমি, অতনু, অসীমা আর রাখী গঙ্গার মনোরম শোভা উপভোগ করলাম বেশ অনেকক্ষণ।

পরেরদিন জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গুরুদোয়ারা অবধি হেঁটে আনন্দনিবাসের অন্য অফিসের সামনে থেকে গাড়িতে উঠলাম। যাত্রা শুরু হল। ঠিক করলাম যদি সন্ধ্যের আগে হারশিল পৌঁছানো সম্ভব হয় তবে সেটাই করা হবে। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ ২১ কিমি। ঋষিকেশ থেকে চাম্বা ৩৪ কিমি। চাম্বা থেকে তেহরি হয়ে উত্তরকাশী ৮৮ কিমি। যেতে যেতে সন্ধ্যে নেমে এল। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি ৩০ কিমির বেশি গতিতে চালানোর নিয়ম নেই। আবার রাত আটটার পরেও আর এগোনোর অনুমতি থাকে না। তাই আরেকটু এগিয়ে উত্তরকাশী থেকে খানিক ওপরে রাস্তার পাশেই সুবিধামত হোটেল দেখে একটা ডরমেটরি নিলাম। তারপর নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা আর ড্রাইভারের রাতের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আড্ডা দিতে লাগলাম আধশোয়া হয়ে। শুরু হল অন্তাক্ষরী। সন্দীপদা নব্বই-এর দশকের হিন্দি গান আর ভোজপুরি গানের ডালি বের করে আসর মাতিয়ে দিল। এরই মাঝে হোটেল থেকে জানিয়ে গেল খাবার তৈরি। সাড়ে নটা নাগাদ রাতের খাবার সেরে সটান হলাম। পরের দিন ট্রেক শুরু করার কথা। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তাই। যদিও পরের দিন ট্রেক শুরু করা যায়নি। আর যায়নি বলেই পূর্বপরিকল্পনার বাইরে গিয়ে আমরা যে নিজেদের ইতিহাস ও মহাকাব্যের সাক্ষী হয়ে যাব অভিযানের শুরুতেই, সেটা আমাদের দূরতম কল্পনাতেও যে আসেনি, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সেই কথায় আসব সময় হলেই।

পরেরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আবার যাত্রা শুরু করলাম। গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ (প্রায় ৮০ কিমি পথ)। জিনিসপত্র একটা হোটেলের সামনে রেখে, আমি আর সন্দীপদা কাগজপত্র নিয়ে ছুটলাম গোমুখ যাত্রার অনুমতি নেওয়ার অফিসে। সেখানে গিয়ে মাথায় হাত। দীর্ঘ লাইন, সকালে অফিস খুলবে কিনা সন্দেহ। রোজ নাকি দেড়শো জনের বেশি অনুমতি দেওয়া হয় না। তাও আবার ফ্যাক্স, নেটবুকিং ও কাউন্টার-বুকিং মিলিয়ে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফিরে এলাম। ঠিক করলাম বিকেলের শিফটে লাইন দেব দুপুর থেকে, পরেরদিনের যাত্রার জন্য। আজ বিশ্রাম নেব সকলে। সেইমতো ফিরে এসে তিনটে ঘর নেওয়া হল। একটাতে আমি, অসীমা, অতনু, রাখী। আর একটায় সোমাঞ্জন, অভিজিৎদা আর ড্রাইভার। আর অন্যটা নবদম্পতি অর্থাৎ সন্দীপদা ও অনসূয়াকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা নিজেদের ঘরে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম। পোষাক পাল্টালাম। তারপর ভাত, মটরের তরকারি, আলু-ফুলকপির তরকারি দিয়ে দুপুরের আহার সেরে আবার সটান হলাম। দুপুরে দুটো নাগাদ বেরোলাম আমি আর সন্দীপদা। বিকেলেও মস্ত লাইন। আমরা আলাদা আলাদা লাইন দিলাম, যারটা আগে এগোয়। অবশেষে অনেক কসরত, তর্কাতর্কি সেরে আমি সুযোগ পেলাম। আর অনুমতিপত্রও আদায় করে নিলাম আমাদের ছয়জনের। ড্রাইভার গঙ্গোত্রীতেই আমাদের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ঠিক হল। কাজ যখন মিটল আমার বিশ্রামের ইচ্ছা চলে গেল। নতুন উদ্যমে জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার তাগিদে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গী হল অসীমা, অতনু, রাখী আর সোমাঞ্জন। প্রথমে বাজার এলাকায়, একটা সুন্দর ঢালাই করা চাতাল আর তাতে বেঞ্চ পাতা ছিল সেখানে। রাস্তার সেই অংশটার ধার ঘেঁষে লোহার রেলিং। অনেকটা দার্জিলিং বা গ্যাংটকের-এর ম্যালের মতো। যার নিচে কুলকুল স্বরে বইছে গঙ্গা। আর দূরে দেখা যাচ্ছে গঙ্গোত্রীর মন্দির। অপর পাশের পাহাড়ে বড় গাছের জঙ্গল। যার মধ্যে পাইন গাছটাই চেনা। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, কখনও মন্দির আবার কখনও জঙ্গলের দিকে। পুরো যেন একটা পিকচার পোস্টকার্ড। তারপর সেটা ছাড়িয়ে বাজার। বাজার বলতে রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ একতলা বা দোতলা দোকান, হয় কাঠের কাজকরা সামগ্রী, ঠাকুরের ছবি, শিবলিঙ্গ, নানারকম পাথর, গঙ্গার জল নিয়ে যাওয়ার পাত্র, ট্রেক করার জন্য লাঠি, পূজা দেওয়ার সামগ্রী এসবের দোকান অথবা কোনও খাবারের দোকান বা রেস্টুরেন্ট। তবে সর্বত্রই শুধু নিরামিষই চলে। খুঁজে রাতের খাবারের জন্য একটা ভালো রেস্টুরেন্টের সন্ধান করে রাখলাম। আস্তে আস্তে বিকেল ফুরিয়ে আসছিল। আরও এগিয়ে চললাম। বাজার একটু হালকা হলে সামনে পড়ল গঙ্গার ওপর কাঠের সেতু। এ-পাহাড় ও-পাহাড়ের যোগসূত্র। সেতুর পাশে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তারপর সেতুর ওপর উঠলাম। এরপর সিঁড়ির ধাপে গঙ্গার জলে। হাতের ক্যামেরা আর মোবাইলও চুপ করে থাকল না। ছবি উঠতে লাগল দেদার। প্রকৃতির। আমাদের। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের। তারপর আবার সেতুর ওপর উঠে এসে গঙ্গার আওয়াজ শুনতে লাগলাম চুপ করে। হঠাৎ কিছু পথচলতি মানুষের কথা কানে এল। আর আমাদের অজান্তেই পুরাণ-ইতিহাস দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ল। যেকথার উল্লেখ আগে একবার করেছিলাম। এবার বিস্তারে সে কথা বলি।

ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি সময় হবে। পথচলতি উত্তেজিত সেই মানুষদের কথোপকথনে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল - 'পাণ্ডবগুহা'। পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম আমরা। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাদের জিজ্ঞাসা করতেই পরিষ্কার হল ব্যাপারটা।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমন্ধে কমবেশি সবাই জানি। এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগে পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদীকে বারো বছর প্রবাসী জীবন কাটাতে হয়। এরপর একবছর অজ্ঞাতবাস। শর্ত এই যে অজ্ঞাতবাসকালীন কারও পরিচয় প্রকাশিত হলে আবারও বারো বছর প্রবাস এবং একবছর অজ্ঞাতবাস কাটাতে হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, "দ্বাদশ বছর গত হতে চলেছে, ত্রয়োদশ বছর উপস্থিত হল বলে; তোমরা বল, কষ্টের এই অজ্ঞাতবাস কোন্ রাজ্যে সর্বোত্তম হবে?"

অর্জুন বললেন, "কুরুদেশের চারদিকে অনেক রমণীয় দেশ আছে যেমন পাঞ্চাল, চেদি, মৎস, শূরসেন, পটচ্চর, দর্শান, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এদের কোনটি আপনার ভালো মনে হয়?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মৎস দেশের বয়স্ক রাজা বিরাট ধর্মশীল এবং বদান্য। তাঁর কর্মচারী হয়ে ছদ্মবেশে থাকব। তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।"*

যুধিষ্ঠির নাম ধরলেন কঙ্ক, বিরাট রাজার সভাসদ হলেন। ভীম 'বল্লভ' নাম নিয়ে পাকশালার প্রধান হলেন। অর্জুন তৃতীয় লিঙ্গ (না পুরুষ, না মহিলা) রূপে বৃহন্নলা নাম ধরে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক হলেন। নকুল ছিলেন অশ্ব বিশেষজ্ঞ, তাই গ্রন্থিক নামগ্রহণ করে বিরাট রাজার অশ্বরক্ষক হলেন। সহদেব গো বিশেষজ্ঞ, তন্তিপাল নাম ধরে গোশালার তত্ত্বাবধায়ক হলেন। দ্রৌপদী ছিলেন কেশসংস্কারে (চুল বাঁধা) পটু, সৈরেন্ধ্রী নামে রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচারিকা হলেন।

বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাসের পূর্বের বনবাস পর্বে পাণ্ডবরা বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়ে ছিলেন অধুনা উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলের পার্বত্যাঞ্চল ও বনাঞ্চলে। সেইসময় বেশ কিছুদিন (বছর কিনা ঠিক জানা নেই) এক পার্বত্যগুহায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। সেই গুহাই পাণ্ডবগুহা নামে খ্যাত। আর তারই অবস্থান নাকি এই গঙ্গোত্রীতে। ওপাড়ের ওই বনাঞ্চলে, তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে। আর পথিকেরা নাকি সেই গুহাদর্শন করেই আসছেন।

শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে শিহরণের একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। আরও জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, রাস্তা নাকি সোজাই। গাইড লাগে না। আলোচনা সারতে মিনিট দু-তিনের বেশি লাগল না।

পাণ্ডবগুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম, তখন পৌনে ছটা বা ছটা হবে। অর্থাৎ সন্ধ্যে নামার আগে আমাদের হাতে আর এক-দেড় ঘণ্টা আছে। দ্রুত অপরপাশের সেই বনের মধ্যে দিয়ে চললাম, চোখ-কান খোলা রেখে, দলবদ্ধভাবে অচেনা জায়গাটা খুঁজে বের করার জন্যও আবার জংলি কোনও জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কাও বটে। বেশ উঁচু উঁচু গাছ জঙ্গলে, ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা ঝোপঝাড় আর পায়ের তলায় পুরু ঘাসের চাদর। মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা জায়গাও। মোটামুটি কিলোমিটারখানেক পর্যন্ত কিছু কিছু বাড়িঘর আর লোকজনের বাস রয়েছে। লোকের দেখা মিললেই জিজ্ঞেস করে করে এগিয়ে চললাম। কিন্তু তারপর জনবসতি আর দেখা গেল না। জঙ্গলও আর একটু ঘন হয়ে এল।

এবার একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। মোটামুটি ৫০-৬০ মিটার দূরে দূরে ঘাসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়া ছোট পাথরের ওপর মোটামুটি স্পষ্ট লেখা – 'পাণ্ডবগুহা'। আর তার নিচে তীরচিহ্ন এঁকে দিক নির্দেশ করা। এটা দেখে একটু খুশিই হলাম। সেই পথনির্দেশিকা দেখে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলাম বটে। তবে পায়ের গতি কমছিল না। ওদিকে দিনের আলোও ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছিল। হঠাৎ একটা উঁচু ঢিবির মত জায়গা। তার চারপাশে খানিক ঝোপঝাড়। আর পথনির্দেশিকাও আর দেখা গেল না। তাই ভাবলাম ওই ঢিবিটাই পাণ্ডবগুহা। সবাই মিলে ঢিবির চারপাশ ঘুরে গুহামুখ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। ঢিবির একটা অংশ খানিকটা ছোট গর্তের মতো। কিন্তু বেশি বড়ও যেমন না, তেমনি গভীরও না। এই ভেবে হতাশ হলাম, যে এটাই পাণ্ডবগুহা আর তা কালের স্রোতে হয়তো মাটি দিয়ে ভরাট হয়ে গেছে। তখন দিনের আলো প্রায় শেষ। অন্ধকার ভিড় করছে চতুর্দিকে। আরও খানিকটা ওপরের দিকে একটু অনুসন্ধান করলাম। যদি অন্য কোন গুহা থাকে, যা আসলে পাণ্ডবগুহা ! আসলে পাণ্ডবগুহা বলে ওই ঢিবিকে কিছুতেই মন মানতে চাইছিল না।

ফেরার পথ ধরলাম। একটা জায়গায় এগোনোর পর হঠাৎ দেখলাম একটা সরু আলপথের মতো একটু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগোচ্ছে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। দু-একজন বলল আর না। অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত। ফিরতে হবে। জঙ্গল এটা। কিন্তু আমরা ক'জন আবার আলোচনা করলাম এতদূর এসে না দেখে ফিরে যাব! যদি এদিকে থাকে! আসল গুহা!

না, এসেছি যখন আর একটু দেখেই যাব। সিদ্ধান্ত নিলাম। আর যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দ্রুত এগোতে লাগলাম সেই পথে। দিনের আলো শেষ হব হব তখন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার সেই পথনির্দেশিকা দেখতে পেলাম। হাঁটার গতি অনেক বেড়ে গেল। প্রায় পাঁচশো মিটার এগোনোর পর কাঙ্ক্ষিত গুহার সামনে যখন দাঁড়ালাম, আনন্দ যেন আর ধরে না। একটু নিচু কিন্তু দুজন মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি করে ঢোকা যাবে এমন একটা মুখ। আর উচ্চতা বড়জোর ৭ কী ৮ ফুট হবে। চারপাশে ঘুরে দেখলাম সেটা একটা গোল বড়সড় পাথরের মতো। অর্থাৎ ভেতরে ঢুকে পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলে বোঝার উপায় নেই যে ওটা পাথর নাকি গুহা। আত্মগোপনের উপযুক্ত জায়গা বটে। অদ্ভুত খোঁজ পাণ্ডবদের! তারিফ না করে পারলাম না! এবার ভেতরে ঢুকে আর একপ্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। সরু ক্যানেলের মতো একটা ঘর যেন। ৮ ফুট বাই ১২ ফুট মতো হবে। ভিতরের উচ্চতা বড়জোর সাড়ে ৬ ফুট। ভিতরটায় অন্তত ছ-সাতজন সাধু ও তাঁদের সাধনার জায়গা। জ্বলছে যজ্ঞের আলো। উড়ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেই আলো-আঁধারিতে গুহার পরিবেশ মায়াময় ও রহস্যময়। সাধুরা অতিশয় ভদ্র, বিনম্র এবং আলাপী। তাঁদের পাণ্ডিত্য ও জীবনদর্শন জ্ঞান শ্রদ্ধা আনে মনে আর সবথেকে বড় কথা আত্মসম্ভ্রমবোধ গভীর। কোনোরকম সাহায্য হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁরা। ভিতর ও বাইরের বেশ কিছু ছবি নিলাম। লক্ষ্য করলাম গুহার অপরপাশে আর একটা মুখ রয়েছে। সেটা বেশি বড় নয়। বড় জোর একজন লোক বেরোতে বা ঢুকতে পারবে, তাও হামাগুড়ি দিয়ে। অসীমা আর আমি বেরোলাম সেই পথে। বাইরে সামনে খানিকটা ঝোপঝাড় আর ঘাসের জমি। তারপর পাথরের উন্মুক্ত সমতল, পাহাড়ের ঢালে শেষ হয়েছে। এগিয়ে গেলাম সেইদিকে একেবারে প্রান্তে পৌঁছে দেখলাম, নিচে বইছে গঙ্গা। আর ওপাশের পাহাড়ে অর্থাৎ যে পাহাড়ে গঙ্গোত্রী শহর, বাজার আর আমাদের হোটেল তার মেইন-বাসস্ট্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে।

মোটামুটি আধঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। এবার সম্বিৎ ফিরল। সন্ধ্যা নেমে গেছে। ফিরতে হবে। ফোনে টাওয়ার নেই। সন্দীপদা হয়তো খোঁজাখুঁজি করছে। একটা টর্চ এনেছিলাম সঙ্গে। আর ছিল মোবাইলের টর্চ। তাই সম্বল করে দ্রুত ফেরার পথ ধরলাম। মাঝে একবার রাস্তা গুলিয়েছিলাম বটে। কিন্তু সেটাকে আমল না দিয়ে আবার সঠিকপথ খুঁজে পৌঁছে গেলাম গঙ্গোত্রীর গঙ্গার উপরের কাঠের পুলের ওপর। মনে তখন অসম্ভব রকম তৃপ্তি আর অদ্ভুত এক ভালোলাগার অনুভূতি।

*ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ রাজশেখর বসু: বিরাটপর্ব: পান্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায়।

~ ক্রমশঃ

~ গঙ্গোত্রী-গোমুখ ট্রেকরুট ম্যাপ ~ গঙ্গোত্রী-গোমুখের আরও ছবি ~

হাওড়া জেলার অঙ্কুরহাটি কিবরিয়া গাজি উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক মৃণাল মণ্ডলের নেশা ভ্রমণ, খেলাধূলা ও সাহিত্যচর্চা।

অমরনাথ দর্শন

নিবেদিতা কবিরাজ

~ অমরনাথ-এর তথ্য || অমরনাথের ছবি || অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ ~

মার্চে সুন্দরবন থেকে ফেরার পরই মান্টামামা বলছিল, "টুয়া আমাদের প্ল্যানটা খেয়াল আছে তো, এবছর কিন্তু যেতেই হবে।" বেশ কয়েকবছর ধরে শুধু আলোচনা আর যাব যাব-তেই থেমে আছে, তারপর আর কিছু এগোয়নি। সময়সীমা তো মোটে দেড় মাস, তার আগে-পরে একটা না একটা ট্যুর ঢুকে পরায় কিছুতেই প্ল্যানটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্ল্যানটা খোলসা করে বলি এবারে, দুর্গম, দুরূহ পথে স্বপ্নের অমরনাথ যাত্রা। মান্টামামা অবশ্য দেখা হলেই বা ফোনে মাঝে মধ্যেই বলত, "তুই আর আমি বেরিয়ে যাব কেউ রাজি না হলেও।" কিন্তু কিছুতেই সেটা আর হয়ে উঠছিল না। আমাদের বেড়াতে বেরোনোর একটা টিম আছে দশ-বারো জনের,সেখানে ভাইও আছে। ওর মেয়ে ঋদ্ধি এখন পাঁচ বছরের; তাই ভাই,অর্পিতা যাবে না। এবছর গুগুলের টুয়েলভ হওয়ায় তুলুরা বেরোবে না, আর ক্রোমেরও সবে পাঁচ পূর্ণ হল, ওর পারমিশন পেতে এখনো দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে, তাই তুলু, অরুণ এই যাত্রার সঙ্গী কোনোভাবেই হবে না এখন। নোনোদা-রা এরকম ট্যুর করার পক্ষপাতী নয়, ওরা পাহাড়কে ভালোবাসলেও আয়েসি ট্যুর পছন্দ করে, গাড়িতে গাড়িতে; পায়ে হেঁটে নয়। দেবাশিস এতদিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারবে না, তাছাড়া তীর্থ করতে চায় না এখনই। মামাইও এখন কোথাও যেতে পারবে না, এম.এস.সি ফাইনাল, চাকরির চেষ্টায় অন্য দিকে মন দিচ্ছে না।

এপ্রিলের শুরুর দিকে মান্টামামাকে ফোন করলাম, বললাম, "মামাকে রাজি করাও, এবছর হলেও হতে পারে, রাজি হলে আমরা তিনজন বেরিয়ে যাব।" এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। পয়লা বৈশাখের দুদিন আগে ধীমানের ডাকে ওর সখের বাড়ি মানে সুন্দরবন-এ গেছিলাম একটা অনুষ্ঠানে। সেখানে ওর ভাই মৃণালের সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ লাগল, মনেই হলনা প্রথম দেখা - খুব অল্প সময়েই এত আপন হয়ে গেলো। ওরাও নাকি এবার অমরনাথ যাবে। শুনে বেশ লাগল, ওর কাছ থেকে সমস্ত তথ্য নেওয়া শুরু করে দিলাম। হোয়াটস্যাপে অমরনাথ নাম দিয়ে মামা, মান্টামামা আর আমি এই তিনজনের একটা গ্রুপ খুলে সব তথ্য আমাদের মামা-ভাগ্নির ইউনিক গ্রুপের মাধ্যমে মৃণালদের দিতে লাগলাম। ওরাও ওদের পাওয়া তথ্য জানাতে লাগল। অমরনাথ যাত্রার পারমিশনের ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে শুনেই মামারা জে এ্যাণ্ড কে ব্যাঙ্কে দৌড়ল, কিন্তু ওই লম্বা লাইনে দাঁড়াতে গেলে আগের দিন রাত্তির থেকে দাঁড়াতে হবে। মৃণাল আগের বছর যাবে বলে পারমিশন করিয়েছিল তাই পদ্ধতিগুলো ওর অনেকটাই জানা। ওর পরামর্শমতো বিভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষাগুলো আগে করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বজবজ থেকে মামা, ইছাপুর থেকে মান্টামামা আর নৈহাটি থেকে আমি একদিন নীলরতন সরকার হাসপাতালে দৌড়োলাম ডাক্তারি সার্টিফিকেটের জন্য, কিন্তু ওখানে গিয়ে যা বুঝলাম, ব্যাপারটা মোটেই অতো সহজ নয়, ওরা আজ নয় কাল করে ঘোরাবে বেশ কদিন। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হল যারা এই সার্টিফিকেটের জন্য দিন দশেক ধরে ঘুরছে। কিন্তু ডাক্তারি সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত ফর্ম তোলা যাবে না, ফর্ম তুলে ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেওয়াও কমপক্ষে এক হপ্তার ধাক্কা। এতদিন নষ্ট হলে যা পারমিশনের চাপ, আমাদের পছন্দ মতো দিনে যাত্রা করা যাবে না। কিছু আটকালেই এখন মৃণাল, ওকেই ফোন লাগালাম। বলল,"দিদি, আমরা বারুইপুর হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেট নিয়েছি। দুদিন যেতে হয়েছে, তোমরা একটু কষ্ট করে বারুইপুর চলে যাও, পেয়ে যাবে।" আমরাও বারুইপুরে দুদিন ধরে গিয়ে বেশিরভাগ টেস্ট ওখান থেকেই আর কিছু টেস্ট বাইরে থেকে করিয়ে ডাক্তারি সার্টিফিকেটটা শেষপর্যন্ত নিতে পারলাম।

এটুকু পেয়েই মনে হল, নাহ্, অমরনাথ যাত্রাটা তাহলে বোধহয় হবে আমাদের। কিন্তু এরপর পারমিশন পেতে হবে, ব্যাঙ্কে যেতে হবে, হয়তো আরও দুদিন লাগবে। পরের দিনই চন্দননগর পি.এন.বি.থেকে ফর্ম দিচ্ছে জানলাম এক ফেসবুক বন্ধুর থেকে, ওখানেই যাব ঠিক করলাম তিনজন মিলে। রাতেই মৃণালের ফোন, ও অনলাইনে পারমিশন অ্যাপ্লাই করতে পেরেছে। বলল, "দিদি, কাল ব্যাঙ্কে যেও না, আমরা পারমিশন পেলে তোমাদেরটাও আমি করে দেব।" শুনে মনে হলো এটা হলে তো ভালোই হয়, আর দৌড়োতে হয় না। কিন্তু মামাকে ফোনে বলায় মামা ঠিক রাজি হল না, বললো, "ব্যাঙ্কে চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এরপর আর ডেট পাবো না, ট্রেনের টিকিট পাওয়াও মুশকিল হয়ে যাবে।" আমি জোর করেই বললাম একটা দিন অপেক্ষা করো, তারপর যা বলবে করব। মামা কথা শুনল। পরের দিন শুনলাম মৃণালদের পারমিশন হয়ে গেছে, ওরা বারোই জুলাই যাত্রার ডেট পেয়েছে। মৃণালের কথা মতো আমাদেরও হয়ে যাবে এই আশায় সমস্ত ডকুমেণ্ট, ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট আর সার্টিফিকেট হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিলাম মৃণালকে। ও অ্যাপ্লাই করে দিল রাতেই, পরের দিনই বেলার দিকে অবশেষে আমাদের পারমিট চলে এল অনলাইনে। মামা, মান্টামামা ভীষণ খুশি। আর দৌড়োদৌড়ি করতে

হবে না, মৃণাল যেন ম্যাজিক করে দিল। অমরনাথ যাত্রা ফাইনাল হল এক নিমেষে, একটা খুশির বন্যা বয়ে গেল যেন আমাদের মধ্যে, তিনজন মিলে ফোনে কনফারেন্স কল করে যাওয়ার তারিখ নিয়ে মেতে উঠলাম।
এই দ্যাখো, ডেটটাই তো বলিনি, আমাদের অমরনাথ যাত্রার দিন ঠিক হল বারোই জুলাই। মান্টামামা পরের দিনই সাতই জুলাইয়ের ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলল কলকাতা থেকে জম্মু যাওয়ার। দুই মামার সঙ্গে ভাগ্নি আমি, এ এক অনবদ্য টিম।
মাঝে দুটো মাস, মে আর জুন, টুকটুক করে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি বলতে কিছু কেনাকাটা, ডেকাথলন থেকে শীতের জিনিস আর ট্রেকিং শ্যু, ট্রেকিং ব্যাকপ্যাক। যত কম ভারী করা যায় ততো ভালো,নিজেকে বইতে হবে,অভ্যেস তো নেই। রেগুলার যোগব্যয়ামের সঙ্গে একটু করে হাঁটা শুরু করলাম মে মাসের শুরুর থেকেই। এখন যা-ই করি মামাদেরকে বলি, ওরাও যেভাবে প্রস্তুতি নেয় বলে, এভাবেই মে মাস কেটে জুন মাস এসে গেল। মৃণালের সঙ্গে ডেকাথলন গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনলাম, বাদ দিলাম ব্যাকপ্যাক, ওটা মৃণাল ধার দেবে বলল, টাকাটা বাঁচল। একটা এসএলআর ক্যামেরা কেনার ইচ্ছে বহুদিনের, কিন্তু দোকানে গিয়ে বুঝলাম কেনার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা নেই। এবারেও মৃণাল সাহস জোগাল,একটু কষ্ট করেই স্বপ্নটা পূরণ করে নিলাম। এসময়ে মৃণাল না থাকলে ইচ্ছেটা সত্যিই পূরণ হত না।
এভাবে জুন কেটে গেল, আমাদের ট্রেনে ওঠার তারিখ ৭ই জুলাই এসে গেল।

কাঁধে একটা ইয়া বড়ো ব্যাকপ্যাক, বুকে একটা ছোটো ব্যাগ আর সঙ্গে চোরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ট্রেন জম্মু তাওয়াই, সময় সকাল এগারোটা পয়তাল্লিশ, ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে। স্টেশনে পৌঁছে মামাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, আমার থেকেও একটা বড়ো ব্যাগ তাঁর কাঁধে, মাত্র তিয়াত্তর বছরের যুবক, বয়েস শুধুই সংখ্যা মাত্র। মান্টামামা পঞ্চান্ন হলেও জানি সে পঁয়ত্রিশকেও টেক্কা দিতে পারে, তার পিঠে মোটামুটি আকারের একটা ব্যাগ,বেশি কিছু লাগে না ওঁর। এক পেটি জলের বোতল তোলা হল ট্রেনে, স্টেশনে কফি খেয়ে ট্রেনে উঠে বসে বললাম, "শেষ পর্যন্ত তাহলে যাচ্ছি আমরা মামা-ভাগ্নি অমরনাথ দর্শনে।" ট্রেন ছেড়ে দিল, মামাদের এক-গাল হাসি, মামা তো বলেই ফেলল, "যদি শেষপর্যন্ত অমরনাথ দর্শন করতে পারি তাহলে সেটা তোর জন্য; ছোট থেকে স্বপ্ন দেখেছি অমরনাথ যাব। এতদিন শুধু ভেবেইছি, সঙ্গী পাইনি। অ্যাদ্দিনে হল।" চোখের কোণ ভিজে গেল আমার, মনে মনে বললাম তোমরা তো বিশ্বাস করবে না, এ যাত্রা আমার তোমার ওপর নির্ভর করে না, ডাক না এলে, তাঁর ইচ্ছে না হলে সম্ভব নয়। একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার দেখলাম, ট্রেনটায় যার সঙ্গেই কথা বলি সে-ই অমরনাথ যাত্রী। মনে বল যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে।
বাড়ি থেকে তিনজনের ভাত, একটু মাছ আর একটু চিকেন করে এনেছি, একটা দিনের দুপুর-রাত্রি করে চলে যাবে আরেকদিন প্যান্ট্রিকারের খাবার নিতে হবে। আমাদের সামনে এক অবাঙালি পরিবার, আলাপ করে জানতে পারলাম বেলেঘাটার মানুষ, যাচ্ছেন অমরনাথেরই পথে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ আলাপ জমে উঠল। গল্প, আড্ডা, সঙ্গে ওঁদের তৈরি চা। ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে এসেছেন, চা কিছুতেই কিনে খেতে দেবেন না, একটু পুণ্যি করতে চান; বললেন, এই যাত্রা পথে এও নাকি এক সুযোগ! অবাক হচ্ছি মনে মনে, মনকে শুদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া যেন।
এভাবেই প্রথম দিনটা কেটে গেল। পরের দিন অবাঙালি ভাবী সকাল সকাল উঠে চা করে ডাকাডাকি, এমন সহযাত্রী পাইনি কখনও। ওঁরা যা খাচ্ছেন আমাদের দিয়ে খাচ্ছেন, আমরাও যা খাচ্ছি ওঁদের দিয়ে, মজার যাত্রা। সকাল গড়িয়ে দুপুর, কেক, চা, বিস্কিট, মুড়িমাখা, তারপর, আগের দিনের ভাত একটু ছিল, এসিতে ভালোই আছে দেখে তাতে জল ঢেলে পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, নুন, আচার দিয়ে এক পেট খাওয়া হয়ে গেল। মামা খেতে খেতে বলল, "সঙ্গে একটা ওমলেট হলে আরও জমে যেত বা ডালের বড়া। কী শান্তি পেলাম রে, ট্রেনেও পান্তাভাতের মজা।" কী খাওয়ার ধুম আমাদের!
ভাতঘুম দিয়ে বিকালে ওঠার পর চা খেতে খেতে ভাবীদের সঙ্গে জোর আড্ডা চলছিল, ঘড়িতে তখন বিকেল পৌনে ছটা, হঠাৎ একজনের মুখে শুনলাম অমরনাথ গুহার কাছে মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রচুর দর্শনার্থী সেখানে, মিলিটারি নেমেছে, অবস্থা নাকি খুবই সাংঘাতিক। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ট্রেনের প্রায় সবাই খবরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি জটিলের দিকে, বৃষ্টির জলের তোড়ে মানুষ ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে টেন্ট, ভেসে যাচ্ছে ভান্ডারা। অমরনাথ যাত্রা আপাতত বন্ধ। ইতিমধ্যে খবরটা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখানোয় বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব, কাছের মানুষ, আত্মীয় স্বজনদের থেকে ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে ট্রেনের যাত্রীদের। 'অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে, ফিরে এসো, ফিরে এসো' ডাক আমাদের সবার মোবাইলে। যেন একটা ঘন কালো মেঘের অন্ধকারে আমরা। যাত্রা বন্ধ থাকলে, রাস্তা বন্ধ থাকলে কেউই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারব না, চিন্তা করার কিছু নেই। যেতে না পারলে কাশ্মীর ঘুরব, ফেরার টিকিট তো ১৮ জুলাই, এই-ই সিদ্ধান্ত হল আমাদের তিনজনের। আগে তো কাল সকালে ট্রেন থেকে নামা হোক। বাড়ি থেকে অহরহ ফোন আসছে, মা, ভাই, দেবাশিসের, এদিকে মামারবাড়ি থেকে, ইছাপুর থেকে। সবাইকে বলে দিলাম, "কাল সকালে আমাদের কাউকে ফোনে পাবে না, একদম চিন্তা করবে না, জম্মু ঢুকে গেলে আমাদের সিমগুলো আর কাজ করবে না ওখানে। জম্মু নেমে পোস্টপেইড সিম নিয়ে তোমাদের নম্বরটা জানিয়ে দেব।"
পরদিন একদম সময়মতো সকাল নটায় ট্রেন জম্মুতে ঢুকে গেল। স্টেশনের বাইরে বেরিয়েই দেখলাম অমরনাথ যাত্রীদের জন্য একটা অফিস, ওখানে সমস্ত ডকুমেন্ট আর পারমিট দেখে একটা যাত্রা-কার্ড দিচ্ছে, যেটা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে, ওটা দেখেই বোঝা যাবে আমরা অমরনাথ যাত্রী। চটপট নিয়ে নিলাম যাত্রা-কার্ড, তারপর দেখলাম রাস্তার উল্টোদিকের দোকানগুলো পোস্টপেইড সিম নিয়ে বসে, ট্যুরিস্টদের জন্য। আমরা একটা জিও, একটা বিএসএনএল পোস্টপেইড সিম নিলাম। তিনজনেই বাড়িতে নম্বরদুটো জানিয়ে দিলাম।
জম্মু স্টেশন থেকে একটু দূরে ভগবতীনগর, যেতে সময় লাগে অটোতে আধঘন্টামতো। ওখানেই বিশাল জায়গা নিয়ে অমরনাথ যাত্রীদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা বিনা খরচে। মামাদের আগেই বলে রেখেছিলাম আমরা ওখানে উঠব না, টেন্টে তিন থেকে চার দিন থাকতেই হবে, পাবলিক টয়লেট তখন ব্যবহার করতেই হবে, বাকি দিনগুলো আমরা হোটেলে থাকলেই ভালো হয়। তাই আর ওদিকে না গিয়ে স্টেশনের কাছে বৈষ্ণোদেবী লজে রুমের আশায় গেলাম, কিন্তু দেখলাম ফাঁকা নেই। পর পর বেশ কটা এরকম ভালো ভালো লজ আছে, পরেরটা কালিকা লজ, ওটাতে ফাঁকা আছে দেখলাম, দেখে আসার সময় ঢালে নামতে গিয়ে পিঠের আর বুকের ব্যাগ সমেত ধপাস করে পড়ে গেলাম পা পিছলে। মামারা হাত ধরে তুলে নিল, কোথাও লাগেনি অবশ্য।
ঢুকে দেখলাম লজটা বেশ সুন্দর, বড় হোটেলের সমতুল্য; লিফটে তিনতলায় উঠে রুম দেখে বেশ খুশি হলাম, ১৮০০ টাকায় এসি রুম তিনজন থাকার জন্য বেশ ভালো। ডাবল বেড সঙ্গে এক্সট্রা বেড, বাথরুমও পছন্দের মতো, যদিও একটা

রাতই থাকব, কাল সকালে পাহেলগাঁও বেরিয়ে যাব, তবুও একটা সুন্দর রুমে থাকলে ট্রেনের দু'রাতের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

চটপট চান করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম, পেটে বেশ টান দিয়েছে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি এক কাপ চা ছাড়া, আসার সময় দেখে নিয়েছিলাম রাস্তার উল্টোদিকে অমরনাথ যাত্রীদের ভাণ্ডারা, ওখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম ভাত আর কুমড়োর ডাল দিয়ে - ওটা নাকি জম্মুর স্পেশাল খাবার। যাই হোক, খিদের মুখে যা পড়ছে তা-ই অমৃত লাগছে। খাওয়ার পর কাল পাহেলগাঁও যাবার গাড়ির খোঁজে আমি আর মামা স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটা লাগালাম,মান্টামামার দুপুরের ভাতঘুম চাই - তাই হোটেলে চলে গেল। আমি আর মামা স্ট্যাণ্ডে গিয়ে কোনও গাড়ি পেলাম না,অগত্যা একটা অটো বুক করে ভগবতীনগর চলে গেলাম বাসের আশায়। ওখানে গিয়ে শুনলাম ভোর তিনটের মধ্যে ওখানে পৌঁছতে হবে আমাদের, তবেই মিলিটারিদের এসকর্ট করা বাসগুলোতে যেতে পারব। প্রাইভেট বাস যেগুলো যায় তারাও যাবে এসকর্ট গাড়ির পিছনে পিছনে,অতএব ওই ভোরেই আসতে হবে, যা বুঝলাম। আমাদের ভগবতীনগরে হোটেল নিলে সুবিধে হত, ভোর তিনটের মধ্যে আসতে গেলে আজ রাতেই লজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। দুটো রাত্রি ট্রেন জার্নির পর আজ তিনজনেরই একটু রেস্ট, একটু ঘুম দরকার - লজের দিকে রওনা দিলাম। ট্রেনে আসার সময় এক এজেন্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নাম মোনাদা। ওঁর ফোন নম্বরটা নিয়ে নিয়েছিলাম কখন কী কাজে লাগে ভেবে। উনি ইছাপুরের বাসিন্দা, গ্রুপ নিয়ে আসেন - ফোন করলাম ওঁর কোনও গাড়ি কাল পাহেলগাঁও যাচ্ছে কিনা জানতে, ফাঁকা থাকলে যদি আমাদের নিয়ে যান। উনি বললেন, হ্যাঁ, গাড়ি যাবে তো। আমরা কজন জেনে নিয়ে বললেন, রাতে জানাব। তখনকার মতো লজে ফিরে আসা ছাড়া আর কাজ নেই, শরীরও আর যেন দিচ্ছে না। ফিরতে ফিরতে প্রায় ছটা বেজে গেল, তখনও বেশ চড়া রোদ্দুর আছে, আমি রুমে ঢুকে শুয়ে পড়লাম, মামারা একটু বসে আবার বেরিয়ে পড়ল বাইরে, আমার ইচ্ছে করল না, ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

রাতেও আর বেরোতে ইচ্ছে করল না খেতে যেতে, মামাদের বললাম,"ভালো করে মুড়ি মাখি, খাও দেখবে ভালো লাগবে।" মুড়ি খেতে খেতেই মোনাদার ফোন, কাল ওঁর একটা গাড়ি যাবে, আমাদের নেবেন, দশটায় ছাড়বে; রেডি থাকতে বললেন। মাথাপিছু ১৫০০ টাকা নেবে। মান্টামামা নিজের এলাকার মানুষ পেয়ে বেশ দর কষাকষি করে তিনজনের টাকাটা ৩৮০০-তে নামাল। রাতে খুব প্রয়োজনীয় ঘুমটাও হল সবার।

পরদিন ১০ জুলাই আমরা সকাল সকাল তৈরি হয়ে মোনাদাকে ফোন করে জানালাম। উনি বললেন, "তাহলে আপনারা নটাতেই বেরিয়ে যান, এসকর্ট করা গাড়িগুলো বেরিয়ে গেছে।" মোনাদা ট্যাভেরা পাঠিয়েছে, গাড়িতে উঠে দেখলাম দুজন ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কেউ নেই; কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানলাম আজ সব ট্রেন লেট, তাই ওঁদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন মোনাদা। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না, গাড়ি তো পেলামই, এতো ভালো পাব আশা করিনি। মনে মনে বললাম হে প্রভু এভাবেই সঙ্গে থেকো। সহযাত্রী দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে জানলাম ওঁদেরও ইছাপুরেই বাড়ি।

চললাম পাহেলগাঁও-র পথে। আমরা তিনজন আর রীনাদি, কৃষ্ণাদি গল্প করতে করতে – কবে যাত্রার তারিখ, কোথায় থাকবেন, যেতে না পারলে কোথায় কোথায় ঘুরবেন। তারপর ড্রাইভারকে বললাম, "ভাই ব্রেকফাস্ট করব, ভালো ধাবা দেখে দাঁড়িও।" ড্রাইভার ঘন্টাখানেক পরে একটা ধাবায় দাঁড় করাল। সেখানে গিয়ে যা শুনলাম তাতে মোনাদার ওপর সবাই রেগে গেল। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অমরনাথ যাত্রা বন্ধ থাকায় যাত্রীদের গাড়িগুলোকে আটকে দিচ্ছে, ভাণ্ডারাগুলোতে হাজার হাজার লোকের ভিড়। রাস্তার এই অবস্থা জেনে আমাদের গাড়িতে কেন তুললেন? থাকতাম নাহয় আমরা জম্মুতেই। যাই হোক, এখন মাঝপথে এসে মাথা গরম করা ঠিক নয়, কেউ আলুর পরোটা কেউ রাজমা-চাউল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিলাম, মাথাও ঠান্ডা হল সবার। ড্রাইভারের ওপর মান্টামামা একটু চোটপাট করায় সে বলল, "চিন্তা করবেন না, আমার বাড়ি পাহেলগাঁওতেই, দেরি হলেও আপনাদের পৌঁছে দেব অন্য পথে।" তখনও বুঝিনি মোনাদার সিদ্ধান্তটাই শাপে বর হতে চলেছে আমাদের জন্য। ড্রাইভার ছেলেটা গাড়ি ঘোরাল হাইওয়ে থেকে, অন্য পথে চলল গাড়ি, রাস্তায় দু'পা অন্তর মিলিটারি। বার বার গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি, ড্রাইভার বলে বাড়ি, আমরা ওর বাড়ির লোক। আমাদের আগেই শিখিয়ে রেখেছিল বলবেন না অমরনাথ যাত্রী, আমরাও গলা থেকে যাত্রী কার্ড খুলে রেখেছিলাম। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

এভাবেই ঘন্টাছয়েকে পৌঁছে গেলাম পাহেলগাঁও, ঘড়িতে তখন বাজে দুপুর সাড়ে তিনটে। সোজা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। মৃণাল কলকাতা থেকে হোটেল বুক করে রেখেছিল,ওদের জন্য দুটো আর আমাদের একটা রুম। হোটেলের ফোন নম্বর দিয়ে রেখেছিল আমায়,তাই সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে অসুবিধে হয়নি। মৃণালরা অবশ্য কাল ঢুকবে। হোটেলে চেক-ইন করে ব্যাগ রুমে রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের কোলে এসে কি হোটেলের ঘরে আটকে থাকা যায়, বেরিয়ে পড়লাম তিনজনে। পাহাড়ি পথে কিছুটা নিচে নেমে লিডার নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চললাম ভুস্বর্গ-এর শোভা দেখতে দেখতে। চারিদিক সবুজ পাহাড়ে পাহাড়ে হাতে হাত ধরাধরি করে লিডার নদীকে ঘিরে রেখেছে,আর প্রশ্রয়-পাওয়া আদুরে চঞ্চল শিশুকন্যার মতো নদী এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে আপন খেয়ালে। আমাদের মনগুলো ফুরফুরে পালকের মতো খুশি খুশি হয়ে গেল,একনিমেষে বয়েস গেল কমে। মান্টামামা নাচতে শুরু করেছে, মামা আর আমি তা দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম,নিজেদের হাসিগুলোও লিডার নদীর বয়ে চলা স্রোতের সঙ্গে তালমেলানো মনে হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধে হয়ে এল, মামা ঘড়ি দেখে বলে উঠল, "চল এবার ফিরি,আটটা বাজে রে"। ফেরার পথে বেশ কয়েকজন মিলিটারির সঙ্গে দেখা, একটু কথা বলতেই বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে দুজন বাঙালি। ব্যস, শুরু হয়ে গেল গল্প,ওঁদের থেকে জানতে চাইলাম অমরনাথ যাত্রার পরিস্থিতি। বললেন, "হয়তো ১১ জুলাই থেকে চালু হবে, কিন্তু পরিস্থিতি ভালো নয়, রাস্তা খুব খারাপ হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। আপনারা আরও দুদিন পাহেলগাঁওতে থেকে যাত্রা শুরু করুন"। গল্পে গল্পে কখন ৯টা বেজে গেছে, শুভরাত্রি জানিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে উঠে এলাম হোটেলে। ফিরে রাতের খাবার খেয়ে গল্প করতে বেশ রাত হয়ে গেল।

১১ জুলাই সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম বৈসরণের পথে, পাহেলগাঁও থেকে ঘোড়ায় বা হেঁটে যাওয়া যায় ৬ কিলোমিটার। পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ চড়াই পথ, একপাশে গভীর খাদ। কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, প্রকৃতির রূপ যেন ফেটে পড়ছে। দূরে কখনও বরফের চূড়া দেখা যায়, কখনও বা ঘন সবুজ পাহাড়ে আড়াল হয়ে যায়। নিচের দিকে তাকালে কখনও গভীর খাদ কখনও বা দূরে কিছু ঘরবাড়ির প্রেক্ষাপট, কখনও কখনও আবার তির তির করে বয়ে যাচ্ছে সুন্দরী ঝরণা। ঘন্টা চারেকের মধ্যেই টুকটুক করে ফটো তুলতে তুলতে,গল্প করতে

করতে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই সাম্রাজ্যে। কচি কলাপাতারঙের সবুজ ঘাসের গালিচার মত বিশাল উপত্যকা এদিকে ওদিকে ঢেউ খেলে আছে, চারদিকে গাঢ় সবুজরঙা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কী অপূর্ব মনোমুগ্ধকর শোভা, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল। সত্যিই ভারতবর্ষে কী নেই, জঙ্গল, নদী, সমুদ্র, মরুভুমি, পাহাড়, পর্বত - পৃথিবীর এক সংক্ষিপ্ত রূপ যেন আমাদের দেশ। জঙ্গল আর পর্বতের আলোছায়ায় বৈসরণ উপত্যকায় বসে দূরে তাকিয়ে এই পরম সত্যকে অনুধাবন করলাম।

এবার একটা মজার ঘটনা বলি। সবুজ ঘাসে বসে বসে দেখলাম জিপলাইনিং হচ্ছে, দেখে খুব ইচ্ছে হল। মামাদের বলেও ফেললাম। মামারাও হৈ হৈ ক'রে বলে উঠল, "কর, কর।" এদিকে আসার সময় ক্যামেরা ছাড়া কিছুই আনিনি, না ব্যাগ না মানি ব্যাগ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম সাড়ে তিনশো টাকা লাগবে। মামারা ওদের মানিব্যাগ খুলে দেখে ওরাও টাকা নিয়ে বেরোয়নি, দুজনের ব্যাগে খুব বেশি হলে চারশো টাকা আছে, আমি তো তাই দেখে কিছুতেই রাইডে যাবনা, মামারাও নাছোড়বান্দা, "মেয়ের একটা ইচ্ছে পূরণ করার সুযোগ পেয়েছি, তোকে করতেই হবে"; এ আরেক আবদার, করতেই হল। মামাদের পকেট ফাঁকা করে দিয়েও কী যে মজা,কী যে তৃপ্তি; ছোট্টবেলার আনন্দের স্বাদ পেলাম যেন। তারপর এক বোতল জল আর দুটো চা-ও হয়ে গেল মামাদের পকেট রাজ্য থেকে, মান্টামামা চা খায় না ভাগ্যিস! চা পানের পর শর্টকার্ট পথে নেমে এলাম ঘন্টা আড়াই-এর মধ্যে,আজ বারো কিলোমিটার দিয়ে শুরু হল আমাদের ট্রেকিং পর্ব। ফেরার পথে পাহেলগাঁওতে এসে দেখি দুই ভদ্রমহিলা বাংলায় কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন, শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে আলাপ করলাম। কবে এসেছেন,কবে অমরনাথ যাত্রা করছেন জানতে চাওয়ায় অনেক উত্তরও পেয়ে গেলাম। ওঁরা আজই ফিরেছেন, দর্শন হয়নি বরফের শিবলিঙ্গ, দেখেছেন প্রকৃতির রূদ্ররূপ। মেঘভাঙা বৃষ্টির সময় সবে পৌঁছেছিলেন ওখানে, পরের দিন সকালে বাবা বরফিনাথ দর্শন করবেন, তাই পছন্দমতো তাঁবুতে ঢুকেছেন। হঠাৎই শুনতে পেলেন "ভাগো, ভাগো, সব ভাগো"; সেই শুনে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখেন দূর থেকে জলস্রোত নেমে আসছে তাঁবুর দিকে, তিনজনে লাফ দিয়ে বেরিয়ে একটু দূরে সরে যেতে পেরেছিলেন, পেছন ফিরে দেখলেন চোখের নিমেষে ভেসে গেলো তাঁদের তাঁবু, যেখানে একটু আগেই ছিলেন। প্রাণভয়ে দৌড়োদৌড়ি করতে থাকেন, শুধু ওঁরাই নয়, তখন ওখানে জনস্রোত, বাঁচার লড়াই, হয়তো তিনিই রক্ষা করেছেন, তারপর মাঝরাতে পৌঁছেছেন পঞ্চতরণী। সেখান থেকে আজ নামতে পেরেছেন পাহেলগাঁও, দুদিন পেটে কিছু পড়েনি,একটু আধটু জল ছাড়া। এগুলো বলছেন আর থরথর করে কাঁপছেন দুজনে, কেন জানিনা ওঁদের কাঁপুনি দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম, "শান্ত হন।´-"সাবধানে যাবেন, বড়ো খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি তো, ভয় হয়।" আরও বললেন, "একদিন দুদিন পরে যান, রাস্তার অবস্থা বড়ই খারাপ।"

হোটেলে ফিরতে তিনটে বেজে গেল, খিদেও পেয়েছে। পাশেই একটা বাঙালি হোটেল, ওখানে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে নিলাম। খবর নিলাম, মৃণালরা হোটেলে ঢুকেছে কিছুক্ষণ আগে। ওরা পাঁচ জন, তাই দুটো রুম নিয়েছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হল, বেশ লাগল। ওদের বললাম, "তোমরা রেস্ট নাও, কাল তো যাত্রা শুরু, সেই নিয়ে কথা আছে।"

রাতে দূরের এক ভাণ্ডারাতে খেয়ে হোটেলে মৃণালদের রুমে ঢুকলাম। ওরা পাঁচজন,আমরা তিনজন এই আটজনের একটা গাড়ি ঠিক হল পরের দিন চন্দনওয়াড়ি যাওয়ার,ওখান থেকেই যাত্রা শুরু। সবাই সবার ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম ঠিক করে। মামা আর আমি পিউকে বড়ো ব্যাগ দিয়ে দেব, ছোট ব্যাগে রেইনকোট, জ্যাকেট,এক্সট্রা মোজা আর ড্রাইফ্রুট, জল নিলাম। গাড়ি আসবে ভোর চারটের মধ্যে, সঙ্গেসঙ্গেই বেরিয়ে যেতে হবে।

১২ জুলাই, অ্যালার্ম দেওয়াই ছিল ভোর সাড়ে তিনটেয়। ঘুম ভেঙে গেছিল অবশ্য আগেই, একে একে ব্রাশ করে তিনজনে রেডি হয়ে নিলাম। পৌনে চারটে নাগাদ মৃণালের ফোন, দিদি গাড়ি এসে গেছে। ভোর চারটে বাজার পাঁচ মিনিট আগেই রুম থেকে বেরিয়ে নিচে এলাম, গাড়ি ছাড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল, অমরনাথযাত্রীদের গাড়ির লম্বা লাইন। ৮ জুলাই বন্ধ হয়ে গেছিল অমরনাথ যাত্রা, তখন থেকেই বহু যাত্রী আটকে পাহেলগাঁওতে, আজ তাঁদের অনেকেই যাত্রা শুরু করবেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের গাড়ি চন্দনওয়াড়ি পৌঁছল যখন, তখন ঘড়িতে প্রায় পৌনে ছটা। গাড়ি থেকে নেমে সবাই একটা করে লাঠি কিনে অমরনাথ যাত্রার গেটে লম্বা লাইনে দাঁড়ালাম। মৃণাল মামাকে প্রণাম করল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই মামাকে প্রণাম করে নিলাম।

গেট পেরিয়ে পিঠের বোঝা নিয়ে যাত্রা শুরু করার আগে একটু দাঁড়ালাম, চোখ বন্ধ আমার। ভেসে উঠল এক বীরসন্ন্যাসী গেরুয়াধারী, মাথা ন্যাড়া, হাতে লাঠি, খালি পায়ে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, স্বামীজীকেই স্মরণ করলাম,স্বামী বিবেকানন্দ অমরনাথের কঠিন দুর্গম রাস্তা খালি পায়েই পার হয়েছিলেন। জয় স্বামীজির জয়। মনে মনে তাঁকে ডাকছি, তোমার ইচ্ছে পূরণ হোক, তুমি নিয়ে গেলে তবেই পারব যেতে, তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম প্রভু। আমার আসল আমি জাগ্রত হোক। চোখ খুলতেই কেন যেন এক বাঁধভাঙা জল চোখে, সম্বিৎ ফিরে পেয়েই হাসতে হাসতে আপনমনে বললাম তোমার নাছোড়বান্দা সন্তান আমি, কিচ্ছু জানি না, হাত ধরে নিয়ে উঠলে তবেই উঠব।

~ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ~

~ অমরনাথ-এর তথ্য || অমরনাথের ছবি || অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ ~

নৈহাটিতে, পরিবারের সঙ্গে গাছ, মাছ, পাখি ও কুকুর নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন নিবেদিতা কবিরাজ। প্রিয় একটি বুটিক আছে। প্রকৃতির টানে জঙ্গলের গভীরতায়, পাহাড়ের প্রাচুর্য আর উদারতার হাতছানিতে নিজেকে মিশিয়ে দিতে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়েন এদিক সেদিক।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর ঠ

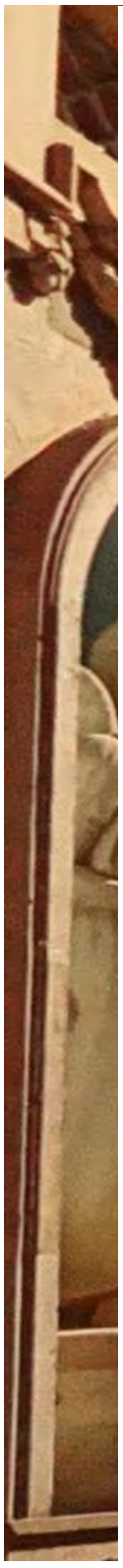

একলা মেয়ে ইথিওপিয়ায়

যশোধরা রায়চৌধুরী

১

জোসেফিন মথুঙ্গালুয়াঙ্কা আমাকে প্রথম খেয়াল করিয়ে দিলেন, আমি এক মহিলা অডিটর, এবং এই গ্রুপে অন্যতম একজন। এক ঝাঁক কালোকোটের মধ্যে, কামিজে অথবা স্যুটে, আমার আলাদা একটা পরিচয়। অডিট টিমের নেত্রী। বাহবা দিলেন। বাহবাটা পেয়ে ঠিক কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেব, বুঝতে পারছিলাম না।
বহুদিন আগে একটি জুলু উপকথা অনুবাদ করেছিলাম, একটা জায়গার নাম ছিল, NTUMJAMBILI... বাংলায় লিখেছিলাম ন্তুনজাম্বিলি। সেই থেকে জানি, এই ধরণের ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তাক্ষর দিয়ে নাম শুরু করার ধারাটি এখানে আছে। বেশ কঠিন উচ্চারণ করা। এম বা এন অক্ষর দিয়ে শুরু হচ্ছে। তারপর আবার ব্যঞ্জনবর্ণ। ম্-ম্ বলার সময়ে যে ম-ম্ উচ্চারণ, সেইভাবে বলতে হবে মথুঙ্গালুয়াঙ্কা, এইভাবে উচ্চারণ করা ছাড়া উপায় নেই। তা সেই জোসেফিন মথুঙ্গালুয়াঙ্কা আমাকে বললেন, আমি গর্বিত যে আপনি মহিলা হয়েও ছজনের এই দলের নেত্রী হয়ে আমাদের অডিট করতে এসেছেন।
বোঝ! এমনটা ত ভেবে দেখিনি কখনো। ভারতের বাইরে অডিট করতে গেলে, দেখেছি অকারণে কলার উঁচু করার এমন মওকা আসে। এবারও এল। এসেছি আদ্দিস আবাবায়, ইউনাইটেড নেশন্স বা জাতি সংঘের আফ্রিকার আঞ্চলিক কমিশনে অডিট করতে। অত্যন্ত কর্মপটু এই মথুঙ্গালুয়াঙ্কা, থুড়ি জোসেফিন। এবং পোশাকে সেই রঙের ছটা। যা বাদামি ও কালো চামড়ার বৈশিষ্ট্য। উজ্জ্বল ছাপা ড্রেস, সঙ্গে বড় পুঁতির মালা ও কানে বড় বড় টপ। সবটাই কালার কো-অর্ডিনেটেড।

ইথিওপিয়ায় বেশ বড় দু তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। এক এই ইকনমিক কমিশন ফর আফ্রিকা। তাছাড়া ইউ এন বা জাতিসংঘের ছাতার তলায় বেশ কয়েকটি সংস্থা এই একই ক্যাম্পাসে। অন্যটা আফ্রিকান ইউনিয়ন। আফ্রিকার ছাপান্নটি দেশ ইকনমিক কমিশনের সদস্য। আর সংস্থায় গিসগিস করছেন অর্থনীতিবিদ আর সংখ্যাতাত্ত্বিক। থিংক ট্যাঙ্ক এটা। গোটা আফ্রিকা মহাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিকে হালকা গুঁতো বা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেন। নেগোসিয়েশন আর হ্যান্ড হোল্ডিং ওঁদের প্রিয় শব্দ। অর্থনীতিবিদের অনেকেই আফ্রিকার নানা দেশের থেকে এসেছেন। তার তলায় আছেন প্রচুর পরিমাণে পাকিস্তানি ভারতীয় কর্মীরা, মধ্যবর্তী পদগুলোয়। যাঁরা অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখেন। আর আছেন সাপোর্ট স্টাফ।

জানা যেটা গেল, তা হল ইউনাইটেড নেশন্স এর নীতি আছে জেন্ডার ব্যালান্স রক্ষা করার। ৪০ শতাংশের বেশি নারীকে চাকরি দেবেন খাতায় কলমে এরকমই বিধি। আমরা সে শতাংশের হিসেব ও অডিট করে দেখলাম। তাছাড়া আছে নানা দেশ থেকে মানুষদের চাকরি দেবার রীতিও।

হঠাৎ পেয়ে গেলাম রত্নখনি এক। নিউ ইয়র্কে ইউ এন হেডকোয়ার্টারের করা এক সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ওপর সার্ভে। যদিও সার্ভে রেজাল্ট গোপনীয় এবং অন্যত্র ব্যবহার করার নিষেধ থাকায় তা আর পাঠকদের কাছে পেশ করতে পারলাম না। কাজের নীতিভঙ্গ করা ঠিক নয়। তবে এটুকু বলাই যায় যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হল ইউ এন-এ রয়েছে যৌন হেনস্থা সম্পর্কে জিরো টলারেন্স নীতি। অন্তত খাতায় কলমে। তবু গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা বলেই, একটি হেনস্থার "কেস" থাকা সত্ত্বেও তা আমরা দেখতে পাইনি। আইনি কড়াকড়ি। যা মন্তব্য টিপ্পনী কেটেছি সবই ওই সার্ভে রিপোর্ট সম্বল করে।

২ এসব ত গেল কেজো কথা। আদ্দিস আবাবায় তিন সপ্তাহ থাকার সূত্রে দেখতে পেলাম কত কী। নিজের চোখের দেখার যা মাহাত্ম্য তাইতে জানা গেল আরোকিছু। খবরের সূত্রে সর্বত্র আলোচিত। নতুন ইথিওপিয়া জন্ম নিচ্ছে, এ দেশের প্রেসিডেন্ট সালে ওয়ার্ক জেউদি একজন মহিলা, ৫০% মন্ত্রী মহিলা। সদ্য ২০১৮ তে ক্ষমতায় আসা আবি আহমেদ এই আশ্চর্য কর্মটি করেছেন। এক নতুন আকাশ খুলছে মেয়েদের জন্য। কিন্তু পথেঘাটে যে মেয়েদের দেখেছি তাঁরা কর্মী, শ্রমিক, ব্যাঙ্ক বা ছোটখাট বিজনেসের কেরানি। হাতে সস্তা কিন্তু চটকদার ব্যাগ, পায়ে হিলজুতো, পাশ্চাত্যের পোশাকে তাঁরা অফিস

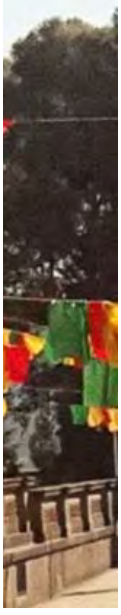

থেকে কিনে খান বাদামভাজা। মানুষের ঢল নামে সকালে আর বিকেলে, অফিস টাইমের ট্রাফিকে। এই মেয়েদের দেখলে আশা জাগে। মনে হয় কর্মভূমিতে মেয়েদের যোগদানের বিষয়টি এখানে বাস্তব। এখানে মেয়েরা নিজেদের জন্য একটুকরো পৃথিবী খুঁজে নিচ্ছে। ছুটির দিনে রাস্তায় দেখি অন্য রকম মেয়েদের। হয়ত বাকি পাঁচটি দিনে ফ্রক বা স্কার্টের মেয়েরাই খ্রিস্ট উৎসব টিমকেট-এর দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথাগত সাজে। সাদা নরম সুতির উজ্জ্বল রং উজ্জ্বলতর রোদ্দুরে ঝকঝকায়। পথে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা দল বেঁধে, লাল বেগুনি ছাতা নিয়ে, আর সাদা ট্র্যাডিশনাল পোশাকে মিছিল করে উৎসবপালনে নামে। তাদের ছিমছাম বাদামি সুন্দর চামড়া মনে করিয়ে দেয় 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' শব্দযুগলের মানে। পুরুষ নারী নির্বিশেষে ইথিওপিয়ার মানুষ অসম্ভব ছিপছিপে। ভুলি না, ছোটবেলা থেকে জেনেছি এ দেশে, বা পার্শ্ববর্তী সোমালিয়ার, দুর্ভিক্ষ আর খাদ্য সংকটের গল্প। ভুলি না এও, যে আজও প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক খেলার মঞ্চেই, দৌড়বীর হিসেবে সোনা জিতে চলেছে ইথিওপিয়ার ছেলেমেয়েরা। যে শীর্ণতা খাদ্যহীনতার সে শীর্ণতা নয়, যে শীর্ণতা সুস্বাস্থ্য আর সু-অভ্যাসের, তাইতেই তাই মজে যেতে পারি আমি।

৩
প্রাচীনতম খাদ্য সংস্কৃতি

ইথিওপিয়ার মানুষের বিনয় আর ভদ্রতার তুলনা নেই। রোগা রোগা মানুষগুলোর সুষমাও দেখার। ছিপছিপে কৃষ্ণবর্ণ সুদর্শন পুলিশ গাড়ি ভুল রাস্তায় ঘুরলে "সালাম" বলে গাড়ি থামিয়ে স্যালুট মেরে পর্চি কাটে, ২০০ বার (ভারতীয় টাকায় ৫০০) নিয়ে নেয় ফাইন হিসেবে, তারপর মিষ্টি হেসে আবার স্যালুট করে। শরীরী ভাষায় বিনীত ভঙ্গিমা।
এখানে প্রত্যেকে টাকা দেবার সময়ে ডান হাতে দেয় বাঁহাতে ডান কনুই ছুঁইয়ে। ভারতীয়দের ভঙ্গিমা। ভিড়ের মধ্যে পাশ কাটাবার সময়ে শরীর কুঁকড়ে আলতো করে সরে যাওয়াটাও সেই একই সলজ্জ বিনয়ী ভঙ্গিমা।
আফিসে, রেস্তোরাঁয় মিষ্টি হাসি, মিষ্টি ব্যবহার, পথের ভিখিরির হেসে নমস্তে বলা, রাস্তার "পালিশ" হাঁকা ছেলের হেসে হেসে তাকানো।
প্রাচীনতম এই খাদ্যসংস্কৃতি। এখানে মোটা হবার স্কোপ রাখেনি ইথিওপিয়া। এদের কোনও প্রথাগত সুইট ডিশ নেই। চিনি বস্তুটিই নাকি এ মহাদেশে ছিল না। খাবার দাবারের মূল আধার ইনজেরা আর সব্জি। মাংস। সব্জির মধ্যে বাঁধাকপি, বিট,

আদ্দিসে প্রথমে ভয়ে ভয়েই খেয়েছিলাম ইনজেরা নামের সেই পাকানো রুটি। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ অনাহারের কাহিনির মাঝে আমরা জানিই না ইথিওপিয়ান খাবারের কথা, তবে সারা পাশ্চাত্য এখন ইথিওপিয়ান ফুড বলতে অজ্ঞান। টেফ নামক এক শস্যের দানা অনেকটা পোস্তোর মত দেখতে। তাকে হামানদিস্তে তে বা জাঁতায় গুঁড়ো করে (কী বিশাল সব ভারি ভারি পাথুরে জিনিস সে সব) তারপর তিনদিন ভিজিয়ে গেঁজিয়ে তুলে, তারপর তাওয়ায় অনেকটা দোসার মত বানিয়ে রোল করে রঙিন বেত বা ঘাসের বোনা ঝুড়িতে রেখে রেখে খাওয়া যায় আরো তিনদিন।
ইনজেরা সচ্ছিদ্র, স্পঞ্জের মত। তাই থালায় ইনজেরা পেতে তাইতে ছোলার ঘুগনি বা রসাকষা মাংসের ঝোল ঢেলে খায়। স্পঞ্জের মত সব ঝোল শুষে ঢোল সে ইঞ্জেরা তখন রসসিক্ত সুস্বাদু। এমনিতে টক টক স্বাদ। ঝোলে ডুবে অমৃত। দেশে বিদেশে গ্লুটেন ফ্রি দানা বলে টেফ দানার খুব নাম। ইনজেরা কারবোহাইড্রেট কিন্তু যেহেতু গ্লুটেন ফ্রি, তাই স্বাস্থ্যকর। গ্লুটেনের থেকেই খাদ্য শস্যে আসে আঠালো ভাব, যেটি থাকে গমের ময়দা বা চালে। কার্বোহাইড্রেট খাওয়া হবে অথচ আপনি মেদবহুল হবেন না। এমনিতেই ইথিওপিয়দের সূক্ষ্মশরীর দেখে দেখে হিংসে হচ্ছে। তারপর যখন জানছি এই ইনজেরা খেয়েই এঁদের এই গড়ন, অধিকাংশ কন্যাই তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা, তখন আরও বেশি ভাল লাগছে খেতে। ইনজেরার স্বাদ, সামান্য ফাঁপানো বলেই টক টক। দোসার ভাইবেরাদর বলে ভাবা যেতেই পারে তাকে। সঙ্গে থাকে নানা ধরণের দানা বা ডালের ঘুগনি বা থকথকে তড়কা জাতীয় বস্তু। অথবা মাংসের লাল লাল ঝোল। সরু সরু কাটা রেড মিটের একটা ভাজি ধরণের জিনিস দিয়ে ইনজেরা অমৃত সমান। সঙ্গে সুপ্রচুর স্যালাড। ইথিওপিয়াতে বিটের স্যালাড খেয়ে আমি মুগ্ধ। মনটা তর্ হয়ে যায় এজাতীয় তাজা সব্জির ভাপানো স্যালাড খেলে। সঙ্গে অনেক লেবু আর অলিভ অয়েলের তরজা একেবারে খোলতাই করে বিটের মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। এই বিট এদের সব লাঞ্চ স্প্রেডেই আছে। আছে বড় বড় ঝালহীন সবুজ লংকা, আছে অনেক গাজর, বাকি ত সবুজ সব্জি আছেই। শসা টমেটো ইত্যাদি। সব মিলিয়ে থালার ওপরে নানা রঙের এমন চমৎকার এক মেলা বসে যায়, বর্ণবহুলতায় যে কোন আর্টিস্টের প্যালেটকে হার মানায়।
কালো কফি আর এই নানা রঙের খাবার, ইথিওপিয়া খাবার দিয়ে জিভের ভেতর দিয়ে মরমে পশিবে খুব দ্রুত।
ইথিওপিয়ার বিখ্যাত কফিতে কোন চিনি দুধের বন্দোবস্ত নেই। ছোট্ট হাতলহীন কাপে কড়া কালো কফি খেয়ে নেয় ঢক করে। পথের ধারে চায়ের ঠেক যেমন ভারতে, এখানে তেমনই কফির ঠেক। ইথিওপিয়াকে ধরা হয় কফিবিন নামক আশ্চর্য যাদু বীজটির জন্মস্থান। কফির উদ্ভিদটি আর কফি পানের সংস্কৃতি দুইই ইথিওপিয়ার মাটিতে জন্মেছে বলে ধরা হয়, যেমন নাকি আদি মানবী লুসি-র হাড় গোড় পাওয়া গেছে বলে এখানকার জীবাশ্ম-বন্ধু মৃত্তিকাস্তরগুলিকে "ক্রেডল অফ সিভিলাইজেশন" বলা হয়।
ভাবা হয় নবম শতাব্দী নাগাদ ইথিওপিয়াতে কফির বাদামগুলো থেকে কালো ওই তরল পানীয়টি আবিষ্কৃত হয়ে। আজ দেড় কোটি ইথিওপিয়াবাসী কফি চাষ, কফি তোলায় ব্যাপৃত। কফি কালচার এতটাই মূলে সম্পৃক্ত ইথিওপিয়ায়, যে ভাষাব্যবহারে, প্রবাদে, বাগধারায়, বার বার এসে পড়ে কফি। সংস্কৃতির ভেতরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এই কফি কালচার। জীবন যাপন এমন কী প্রেম ভালবাসার কথাতেও কফি এসে যায় বার বার। যেমন "বুনা দাবো নাও" শব্দবন্ধের মানে "কফি আমাদের রুটি"। আরেকটা এমন বাগধারা, "বুনা তেতু"। এই আমহারিক বাক্যাংশের মানে, "কফিপান" হলেও, এর অর্থ সামাজিক মেলামেশা, কফিপানের সূত্রে দেখাসাক্ষাৎ। উত্তর ভারতীয়দের চায়পানি, বা বাঙালির চা খাবেন তো, বা আরো বেশি করে 'চায়ের আড্ডা' মনে পড়ছে, তাইনা? 'আমার কফি পানের সঙ্গী নেই' আমহারিক ভাষায় এটা বলা মানে আমি নিঃসঙ্গ।

বসা গপ্পুড়ে একদল চা খোর, হাতে ধূমায়িত কাচের গেলাস বা মাটিরভাঁড়, আদ্দিসে এসেই চোখে পড়েছিল সেরকম সব ঠেক। বুঝিনি ওগুলো কফির ঠেক। শেষমেশ লাঞ্চের পর সরকারি ছাপ্পামারা গাইড নিয়ে গেল কফি খেতে ওরকমই এক ঠেকে। প্লাস্টিকের টুল পেতে বসতে দিল মিষ্টিমত মেয়েরা। সামনে ধূপ ধুনো জ্বেলে, গোল থালায় কফি বিন রেখে, কালো সরুগলা কফি-পাত্রটি ঈষৎ হেলিয়ে উনুনের ওপর রেখে সে এক মহাযজ্ঞ।
কফি এল হাতলহীন ছোট বাটিতে। কুচকুচে কালো কফি। চিনি চলবে কিন্তু দুধ মেশানো চলবে না। তিক্ততায় মার্কিন কফিকে পুরো চার গোলে হারিয়ে দেবে। ভীষণ মিষ্টি দেখতে সবুজ পাতা দেবে সঙ্গে, হার্বটির নাম "রু", সেটায় আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ। কফিতে ফেলে দিলে কফিও সুগন্ধিত, আমোদিত।
রাশি রাশি লোক গোল হয়ে টুলে বসে কফি খাচ্ছে, রাস্তাঘাটে এইটে দেখার পর মনে হয় কত চেনা এই দেশ, এই সংস্কৃতি।

৪
আদিমাতা লুসি

মিউজিয়ামের গল্প বলি, যেখানে লুসিকে দেখেছিলাম। আদিমাতা লুসি। ইথিওপিয়া হল ক্রেডল অফ সিভিলাইজেশন। তাই এখানেই পাওয়া গেছে এই নারীর হাড়গোড়।
লুসি হল ৩ মিলিয়ন বছর আগের নারী। পূর্ণ বয়স্কা নারী। কেননা আক্কেল দাঁত অব্দি উঠে যাওয়া চোয়াল পাওয়া গেছে। দাঁত ও পেলভিক বোনের স্ট্রাকচার দেখলে বোঝা যায় যে এই প্রাণী বাঁদরের চেয়ে বেশি মানুষ। তাই এ ছিল ১৯৭৫ নাগাদ আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মানুষ। ওর স্থানীয় নাম দেন্লেস্ক, বা অনন্যা।

লুসিকে দেখা আদ্দিসে যেমন জরুরি, তেমন জরুরি হাইলে সেলেসির প্রাসাদ দেখা। এই সম্রাট ইথিওপিয়ার নবজন্মদাতা। তাঁর দান করে যাওয়া বিশাল প্রাসাদ আজ বিশ্ববিদ্যালয়। আদ্দিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটির একাংশ এখন যাদুঘর।

ইতালিয়রা সেলেসির প্রাসাদের বাগানের সিংহদের গুলি করে মারে, একটি সিংহের স্টাফ করা দেহ দেখিয়ে সেই রোমাঞ্চকর ভয়াল ইতিহাস বলেন গাইড। প্রতি সংগ্রহালয়ে, প্রতি ক্যাথিড্রালে চিহ্ন আছে, হাতে আঁকা লোকরীতির বড় বড় প্যানেলে পটচিত্রের স্টাইলে আঁকা আছে পরবর্তী বিশাল এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ইতালিয়দের দূরে হটিয়ে আবার ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের সে ইতিহাস। যার হিরো সেলেসিই, আর কেউ নয়।
আমরা দেখি সম্রাটের শোবার ঘর, তাঁর ডাকটিকিটের সংগ্রহ, ভারত থেকে আসা বড় বড় মানুষের সই যেমন রাধাকৃষ্ণনের ... ছবি, উপহার...। সেলেসি ১৯৬১ অব্দি সম্রাট ছিলেন, ওই প্রাসাদও ছিল তাঁর। ১৯৬৩ তে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়ে যায়।

পথ হারানোর গল্প

খোলা আকাশ, পাহাড়, ক্যাথিড্রালের সামনে বিশাল ঢাক বাদ্যি বাজিয়ে টিমকেট। অসামান্য স্যালাড আর ইনজেরা খাওয়া। আর অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কার যেন বাঁশির সুর। অনেক রাত অব্দি পাশের হোটেলে শনিবার রাতে পার্টি করা ইউরোপিয় যুবকযুবতীদের হুল্লোড়। সকালে দুপুরে পথে দেখা বেকার স্থানীয় যুবক, বৃদ্ধ ভিখিরি। ভিখিরি বৃদ্ধের চেহারা সারা পৃথিবীর যে কোন গরিব মানুষের মত। চোখে শত শত বছরের ইতিহাস ছলকে ওঠে।
আমি একা মহিলা, কালো ট্রাউজার আর সাদা ব্লাউজে, গলায় ইউনাইটেড নেশন্স এর ব্যাজ ঝুলিয়ে আপিস যেতে যেতে ভাবি, এই পৃথিবীকে সাদাকালোয় দেখা আমার আর হল না।/p>

আদ্দিসের দ্বিতীয় দিন লড়াই লড়াই লড়াই চলছে তখন। একটা দল নিয়ে অডিট করতে এসেছি। তবে দলে আমিই দলছুট, আমি হোটেলে। অন্যেরা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। হোটেলটা গুগুলে দেখিয়েছিল অফিসের কাছে, হাঁটা রাস্তায়, কিন্তু আদপেই তা নয়। হাঁটতে পারা যায় না।
এমনিতেই এই আদ্দিস হল পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতম রাজধানী। ফলত হাঁটলে একটু সময়েই খুব হাঁপিয়ে পড়ি আমরা। জানুয়ারি মাস, শীত আছে তবে সাংঘাতিক নয়। বাতাস স্বচ্ছ, আকাশ নির্মল। শিল্প বেশি নেই তাই দূষণ নেই। আকাশের নীল ঈগলের নখের মত ধারাল। চারিপাশে জবা ও ঝুমকো লতার ঝোপ। অথচ হাঁটলে আউট অফ ব্রেথ লাগে। হাঁটার পথে চড়াই উৎরাইও প্রচুর।
পরিবেশ আরও ঘোরালো করে তুলেছে হাঁটা রাস্তায় অগুনতি মানুষের ভিড়। ময়লা জামাকাপড়ের দরিদ্র বেকার যুবক... মোটামুটি ভদ্রস্থ অফিসগামী তরুণতরুণীর ভিড়ে পথ চলা দায়। তাছাড়াও শতচ্ছিন্ন পোশাকে ভিখিরি, যাদের পথে ঘাটে দেদার দেখছি। একেবারে তৃতীয় বিশ্বের ম্যাক্সিমাম দুরবস্থার চিত্রটি আদ্দিসে দেখা গেল।
আর সেই জাতিসংঘের ম্যান্ডেটরি সিকিওরিটি ব্রিফিং। এখানে নাকি রাস্তায় বেরলেই স্ন্যাচিং মাগিং চুরি বাটপাড়ি ছিনতাই। এমন ভয় দেখিয়েছে গোড়া থেকে!!!
কাল ত আমরা সদলবলেই হাঁটলাম, হেঁটে ফিরলাম আপিস থেকে আমার হোটেল অব্দি। আর ওরা গেল ট্রেনের স্টেশনে বাদুড়ঝোলা ট্রেন ধরতে। আমাকে পথে মাতাল বিশালাকৃতি এক মানুষ তেড়ে এল কীসব বলতে বলতে। কোনমতে এড়িয়ে

বলে জামা টেনে মুখে আঙুল দিয়ে বোঝায় তিন দিন খাওয়া হয়নি। বৃদ্ধ ভবঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর অজস্র বেকার যুবক সিগারেট টানে ফুটপাতে খবরের কাগজ পেতে বসে। তৃতীয় বিশ্বের মলিনতা এঁটে বসে আছে এ দেশে, এ শহরে।
কাল পথে অনেকটা হাঁটলাম, আজ কাগজপত্র সব হোটেলে রেখে বেরলাম, তথাপি যেন আজই বিপদ ঘটার অবস্থা ছিল। সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় এরকম বিপদেও পড়ে মানুষ?
ট্যাক্সি প্রথমে ভুল পথে চলতে শুরু করল। কালকের ট্যাক্সি যেদিকে গেছিল তার উল্টোদিকে। কিন্তু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যতবার বলছি ই সি এ, সে তার স্মার্ট ফোনের জি পি এসে দেখায়, সে ত ই সি এ যাচ্ছেই। তাহলে আর কেন চেঁচাই। চুপচাপ বসে রইলাম। আমার স্মার্টফোন কাজ করছে না কারণ লোকাল সিম নেই। লোকাল সিম নেই কারণ সিমের দোকান খুঁজে পেলেও তা বন্ধ ছিল আর অনেক কাগজ পত্র লাগবে সেসব নিতে, তাই কাল হয়নি।
আমহারিক ভাষা বলেন ইথিওপিয়াবাসীরা। ইংরেজি বোঝেন। তা, ই সি এ-র এক নম্বর গেটের সামনে এসে ট্যাক্সি আমাকে ছেড়ে দিল। সে গেটে বাইরের গাড়ি অ্যালাউড না। শুধু জাতিসংঘের স্টিকার দেওয়া গাড়ি। এদিকে সেই গেট এমন নিশ্ছিদ্রভাবে তৈরি, যে তা দিয়ে শুধু গাড়ি ঢোকে, কোনও ব্যক্তিমানুষ হেঁটে ঢুকতে পারবে না। এদিকে আমিও কলকাতার কিপ্টে, ভাবলাম ট্যাক্সি নিয়ে আবার কোথায় কোথায় ঘুরব, আমার চেনা তিন নং গেট পৌঁছতে গিয়ে আরও দেড়শ টাকা (ওদের টাকার নাম বার) নিয়ে ফেলবে। তাছাড়া এক থেকে তিন নং গেটে গাড়ি নিয়ে কিভাবে যাওয়া যায় তাও জানা নেই, তাছাড়া ও ভাষা বুঝছে না, আমাকে ওখানেই নামিয়ে দিতে চায়, কারণ নিয়ম মতো ও ত আমাকে ই সি এ তে পৌঁছে দিয়েইছে!!!
ট্যাক্সি ষাট বার নিল, আর আমাকে এক নং গেটের সামনে ফেলে চলে গেল। কিন্তু আমি ত অথৈ জলে পড়লাম। গেটের লোকরা ত লোকাল, ভাল ইংরেজি বোঝেনা। যতই আই কার্ড দেখাই নিয়ম থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুতি চলবে না। সাফ বলল, গো টু গেট টু। ব্যাস। হাঁটা শুরু। হেঁটেই চলেছি হেঁটেই চলেছি, ই সি এ র পাঁচিল শেষ হয়ে গিয়ে ভাঙাচোরা রাস্তা আর অচেনা বাড়ি, ঘর দোর শুরু। আর পথে লয়টারিং লোয়ার ক্লাস ত আছেই। তার ওপর উচ্চাবচ রাস্তা, অল্পেই পুরো হাঁপ ধরে যাচ্ছে। ভয়ে বুক ধক ধক করছে। উফফ সে কী দুঃস্বপ্নের মত নরক যন্ত্রণা। আমার এটা খুব ফেভারিট দুঃস্বপ্ন, এমনিতেও বহুবার দেখেছি। অচেনা শহরে পথ হারিয়েছি, কেউ আমার ভাষা বুঝছে না। এ স্বপ্নও সত্যি হল তবে!!
হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় এসে এক মহিলা দেখলাম বারান্দায় কার্পেট ঝাড়ছেন, ছোট ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাষা বুঝলেন না। তারপর অফিসগামিনী এক মেয়েকে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। জিগালাম, ই সি এ কোনদিকে? সে যেদিক বলল সেদিকে খানিক গিয়ে হিন্দি সিনেমার সর্বধরণের ক্রাইমের আখড়ার মত দেখতে একটা বিশাল কনস্ট্রাকশন সাইটের পেল্লায় পেল্লায় খাঁচার মত স্ট্রাকচারের মধ্যেখানে এসে পড়লাম, কোন প্রপার রাস্তা নেই, ঘেঁষ ফেলা কাদা ভরা ভাঙাচোরা রাস্তা আর তার মধ্যে দিয়ে গাড়িও চলেছে। কোনমতে হাঁটছি আর দেখছি নোংরা চটের বস্তা পরা কুলি কামিন শ্রমিকরা কাজ করে চলেছে শুধু।
ধুম ধাম আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল ঘাড়ের ওপর এবার যদি ষোল তলা থেকে একখান ভর্তি সিমেন্টের বস্তা এসে পড়ে, কাগজে বেরবে সিমেন্টের বস্তা চাপা পড়িয়া ভারতীয় অডিটরের আদ্দিস আবাবায় বেঘোরে মৃত্যু।
উফফ। সেই ভাঙা রাস্তা অবশেষে এসে পড়ল আয়ারল্যান্ড আর জার্মান কনসুলেটের গেটে। তারা আমাকে পরের গেট, পরের গেট বলে দিল। ইউনিফর্ম পরা শিক্ষিত দারোয়ান বা অফিস যাত্রী মহিলা ছাড়া আর কেউই নেই জিজ্ঞাসা করার মত। শেষ মেশ আপিসের তিন নম্বর গেট। প্রচুর কাগজ পত্র দেখান। ভেতরে ঢুকে ধড়ে প্রাণ এল।

৬
ভারতের চিত্রতারকা ও ইথিওপিয়ান

আজ আমাদের গাইড বলল সে অক্ষয় কুমারের ফ্যান। তাছাড়া শাহরুখের কথা ত জনে জনেই বলে। আজ আমাদের প্রহ্লাদ সিং-কে শাহরুখের ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গাইড অন্য এক ইথিওপিয়ানের সঙ্গে। এখানে লোকাল ভাষায় হিন্দি ছবিগুলো ডাব করা হয়, বড়সড় এক ইন্ডাস্ট্রি।
মুসলমান হওয়াতে সালমান শাহরুখ আমিরের গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। শাহরুখ নামে কোন এক মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত সুলতান ত ছিল। সেটাও বলল কে যেন। স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।
বাজারে আমাদের দেখে, কিনতে ডাকছিল। গাদা গাদা লোক নমস্তে নমস্তে বলছিল, অনেকে বাবুজি বলে হাঁক দিচ্ছিল। আর ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বলে আওয়াজ দিতেও শুনলাম অনেক কে। আমরা ছজনে ভারতের চার দিক থেকে এসেছি। আমি কলকাতা, দুজনে দক্ষিণী, দুজন লখনউ আর একজন বিহারী। তাও আমরা যে ভারতীয় সেটা বাইরের দেশে এলে লোকে কেমন সহজেই বুঝে ফেলে, আজও।
মেরকাতোতে এক বিশাল বড় বোচকা নিয়ে একটা লোক আসছিল, আমি শামসেরকে বললাম হট যাও, অমনি সেই মজুরটি হজ্জাও হজ্জাও বলে চেঁচিয়ে উঠল।

৭
ধর্মের মেল্টিং পট

লালিবেলার সুপ্রাচীন প্রস্তরনির্মিত ক্রসটি দেখলে কেন জানি না আমার মক্কার কাবার কথা মনে পড়ে। প্রাচীনতা, বিশালতা, আর তীর্থযাত্রীদের নিবিড় ধর্মচেতনায় কোথাও কি মিল আছে? হয়ত অনধিকারীর মত কথা বললাম।
অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম, ইথিওপিয়ার দুটি প্রধান ধর্ম, মোহাম্মদের সময় থেকে সহাবস্থান করেছে। নবী মোহাম্মদ জীবিত থাকাকালীন ইসলামে প্রথম বিশ্বাসীরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সংস্কৃতিগতভাবে অর্থোডক্স চার্চ উচ্চভূমির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তার

খ্রিস্টান দার্শনিক ভারতে যাওয়ার পথে ইথিওপয়ার উপকূলে জাহাজ ভেঙে পড়েছিল। মেরোপিয়াস মারা গেলেও তার দুই সন্তানসম ফ্রুমেন্টিয়াস এবং এডিসিয়াসকে উপকূলে পেয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ফ্রুমেন্টিয়াস পরে নীলনদ বেয়ে মিশর যান, খ্রিস্টধর্মের আদি রূপটিকে খাতায় কলমে নথিবদ্ধ করার কাজ এঁদের করা।
গভীর সূত্রে গাঁথা আছে ইথিওপীয় খ্রিস্ট ধর্ম পূর্ববর্তী ইহুদি ধর্মের সংগে। নানা ধরণের পূজা পদ্ধতি, নানা প্রথাগত আচারবিচার সবই নির্দেশ করে সেদিকে।
ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যা ইহুদি ধর্মের মূলেও রয়েছে তা হল প্রতিটি চার্চের হোলি অফ হোলির সিন্দুকের প্রতিরূপের উপস্থিতি, যাকে ট্যাবট বলা হয়। যা শুধুমাত্র পুরোহিতদের দেখার এবং পরিচালনা করার অনুমতি থাকে। অর্থাৎ অধিকারীভেদ, পুরোহিতের বিশেষ অধিকার, এই বিষয়টি মিলে যায়।

আমাদের দেশের বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো, ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মে আছে বছরে দেড়শোর বেশি দিবস ও উৎসব। টিমকেট তার অন্যতম। এপিফ্যানির উৎসব এটি। এটাতে ওই সিন্দুক বা ট্যাবট নিয়ে শোভা যাত্রা করা হয়। যাওয়া হয় জলের কাছে, যে জলাশয়ে খ্রিস্টের মাথায় জলসিঞ্চনের মাধ্যমে দীক্ষাদান অভিষেক হয়েছিল তার প্রতীক হিসেবে।
এই টিমকেটের দিনেই পথে নেমে আসা সাদা প্রথাসিদ্ধ পোশাক পরা মেয়েদের ঢল নামার কথা আগে লিখেছি। ঢোলক বাজিয়ে ঝুমঝুমি র মত কাঠের বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রার সংগে চলা মেয়েরা। তাদের সবার মাথা ঢাকা। সে ঘোমটা সাদা সুতির ইথিওপীয় কাপড়ে। সে কাপড় নরম সুন্দর, কারুকাজ করা পাড় দিয়ে মোড়া।
মাথা ঢাকা দেখলে ভুল হয়, হিজাব পরিহিতা মুসলিম মেয়েদের দেখছি কিনা। না, এঁরা অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতা।
ধর্ম, পোশাক, নারীর দিনগত জীবন সবটাই ওই বিশাল মানুষের ভিড়ে মিলেমিশে একাকার।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর যশোধরা রায়চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে। কবি ও গদ্যকার। পণ্যসংহিতা (১৯৯৬) প্রথম গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে পরিচিতি। কৃত্তিবাস পুরস্কার ১৯৯৮ ও বাংলা আকাদেমি অনিতা সুনীল কুমার বসু পুরস্কার ২০০৬। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সতেরটি, গল্পগ্রন্থ ও নিবন্ধগ্রন্থ বেশ কয়েকটি। অনুবাদ করেন মূল ফরাসি থেকে। বিবাহসূত্রে ফরাসি ভাষাবিদ তৃণাঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে আবদ্ধ।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়া – সাতান্ন বছর পরে আবার

তপন পাল

বিমানবন্দর। ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের উড়ান VN 0843, Airbus 321, VN A 399, কাম্বোডিয়ার সিয়েম রিপে নামলাম। সিয়েম রিপে-র পরিবহনের প্রধান মাধ্যম স্কুটার রিকশা। দু চাকার ওপর লোহার কাঠামো, ছাদ; মুখোমুখি দুজন দুজন চারজনের বসার বন্দোবস্ত। গাড়িটির সামনে একটি হাতল, তার শীর্ষে স্প্রিং-এর আংটা। মোপেড বা স্কুটার বা মোটর সাইকেলের পিছনে আটকে নেওয়ার জন্য। দ্বিচক্রযানের পিছনে সংযুক্ত হয়ে পাঁইপাঁই করে দৌড়য়, সরু বা জনাকীর্ণ রাস্তাতেও নব্বই ডিগ্রিতে বাঁক নিতে পারে। প্রতিটি গাড়ির গায়ে মালিকের নাম লেখা।

শ্যাম কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম', - মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।

চার তারিখ দিনটি ছিল আঙ্করভাট (মন্দির-শহর)-এর জন্য। সকাল আটটায় বেরিয়ে সাঁইত্রিশ ডলার দিয়ে সারাদিনের টিকিট নিয়ে আমরা চত্বরে। আঙ্করভাট নিয়ে বলা শেষ হবে না। একটি ভ্রমণগন্তব্য, সেই সারা দেশটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার জন্যেই গড়ে উঠেছে একটি আস্ত বিমানবন্দর, একটি শহর, হর্ম্যরাজি, দেশের পতাকাতেও তার সোচ্চার উপস্থিতি – তার পাব স্ট্রিট যেন ব্যাংককের খাও সান রোড, রাত যেখানে নির্ঘুম, নির্নিমেষ, অনিঃশেষ; বিশ্বজগৎ যেখানে এসে মেশে। মধ্যরাত্রে ধুতি পরে পানশালায় ঢুকতেই গান গাওয়ার ফরমাশ। আমি তালকানা সুরকানা গলাভাঙা, কিন্তু ভিতু নই। সত্তরের দশকে বজবজ লোকালে এক অন্ধ ভিক্ষুককে গাইতে শুনতাম 'ও গো গোয়ালিনী দোকান খোলো দেখি, পসরা সাজাও দেখি, যে ঘাটে রাধিকা হবে পার, কানাই সেই ঘাটের মাঝি। ও রাধে গো নিতি নিতি যাও গো রাধে আমায় ফাঁকি দিয়া, এবার পারের কড়ি দিয়া যাও নইলে তো আর ছাড়বোনা সাঙ্গ করে দেব বেচাকিনি, ও গো গোয়ালিনী'। উচ্চকিত বাদ্যবৃন্দের সাথে তাই গেয়ে দিলাম। সঙ্গে ইন্টারলিউড 'তাইরে নাইরে না দুটো ছোলা ভেজাও না'; এক কৃষ্ণাঙ্গী রাইকিশোরী ঘুরে ঘুরে লংস্কার্ট উড়িয়ে নাচলেন। কী হাততালি সে আর কী বলব! খুব মজা লাগছিল। কেউ কাউকে চিনিনা। ইহজীবনে আর দেখাও হবে না। চলে যায় দিন, যতখন আছি পথে যেতে যেতে কাছাকাছি আসার সুবাদে মুখের চকিত সুখের হাসি দেখে অকারণে গান গাওয়া। জগতে আনন্দযজ্ঞে সত্যিই আমার নিমন্ত্রণ।

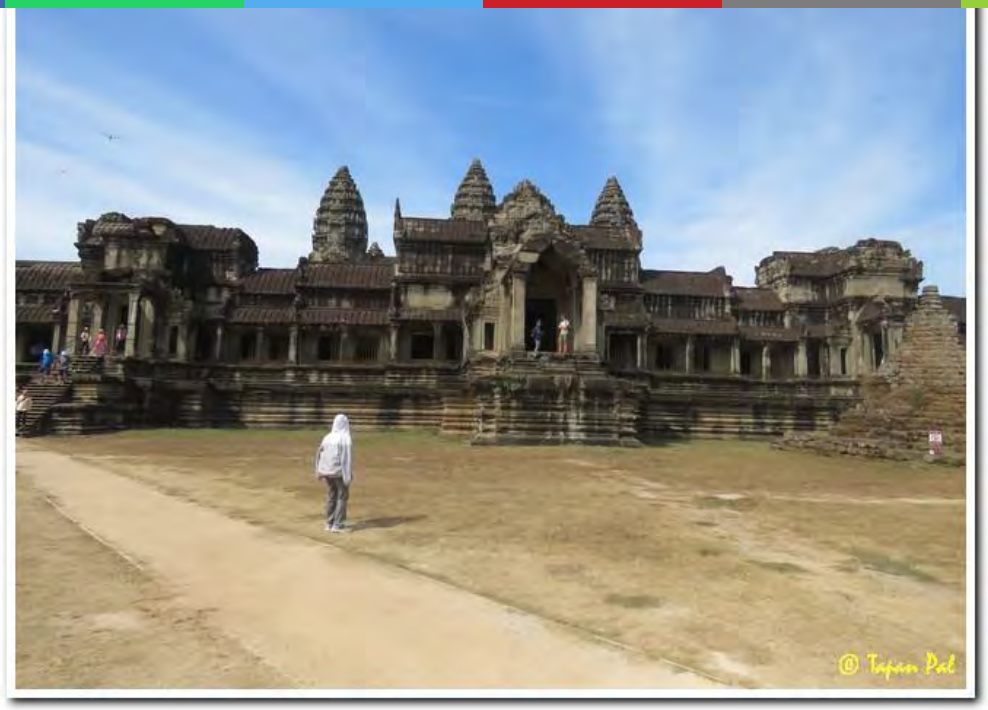

আঙ্করভাট দেখতে গিয়ে স্মৃতি কল্পনা আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার! আঙ্কর দেখেছি কোন শৈশবে, কিন্তু তার পর বাবা মার মুখে তার এত গল্প শুনেছি, পারিবারিক এ্যালবামে তার সাদা কালো এত ছবি দেখেছি যে যাই দেখি মনে হয় 'ঠিক গেলবারের মতো'।

এই মন্দিরে যেহেতু সারা পৃথিবীর পর্যটক আসেন, তাই পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষায় কথা বলা গাইড এখানে আছেন - চিনা, ইংরেজি, হিন্দি-উর্দু, স্পেনীয়, আরবি, পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, জার্মান, ফরাসি – সবাই। এমনকি বাংলাও। আমাদের গ্রুপের জন্য একজন ইংরাজিভাষী গাইড বরাদ্দ হয়েছিল। তবে বাংলাভাষী গাইড দেখে আমার বাংলা প্রেম চাগিয়ে উঠল। একজনকে বললাম আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে।

তারপরেই স্বপ্নভঙ্গ। তিনি যে বাংলা বলতে লাগলেন সেটি কলকেত্তাইয়া বাংলা নয়; বাংলাদেশি বাংলা – স্প্যানিশের চেয়েও দুর্বোধ্য। সবিনয়ে তার সম্মানদক্ষিণা (কুড়ি মার্কিন ডলার; কাম্বোডিয়ার সর্বত্র মার্কিন ডলার চলে, তাদের নিজস্ব মুদ্রা কাম্বোডিয়ান রিয়েল কেউ ছুঁয়েও দেখে না) মিটিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম ইংরাজিভাষী গাইডের ছত্রছায়ায়। বেঁচে থাক ইংরাজি ভাষা! মার্ক টোয়েনের সেই উক্তি মনে পড়ল - There is no such thing as the Queen's English. The property has gone into the hands of a joint stock company and we own the bulk of the shares! ইংরাজি ভাষা ঠিক যতখানি রানির, ঠিক ততখানিই আমার।

আঙ্করভাট চত্বরে বেড়াবার তিনটে নিয়ম। মন্দিরে ঢোকার সময় কাঁধ ও হাঁটু ঢাকতে হবে। ভিক্ষুদের সঙ্গে কথা বলার বা তাদের স্পর্শ করার চেষ্টা করা যাবে না। রক্ষীরা যতবার চাইবেন ততবার কার্ড দেখাতে হবে। দর্শনার্থীদের অধিকাংশ সাহেব মেম। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এসে গরমে তাদের হাঁসফাঁস অবস্থা। তাদের সার্বিক পোশাক হাপ পেন্তুল আর স্যান্ডো গেঞ্জি। তাদের জন্য সারা মন্দিরশহর জুড়ে পাজামা আর হাপ আলখাল্লা বিক্রির ধুম লেগেছে। কোন একটি মন্দিরের সামনে সাহেব- মেমরা বাস থেকে নামছেন, পাজামা আলখাল্লা কিনছেন, লাফিয়ে লাফিয়ে পরছেন, সেই মন্দিরটা দেখছেন, তারপর সদ্যকেনা পাজামা আর হাপ আলখাল্লা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, পরের মন্দিরে ফের কিনছেন।

মন্দিরচত্বরে শাড়ি পরা শ্রীমতী পালকে দেখে এক ইন্দোনেশিয়ান মহিলা এগিয়ে এলেন। তুমি কি ওড়িশা থেকে আসছো? তার খুব একটা দোষ নেই, শ্রীমতী পালের শাড়িটি ছিল ওড়িশার। ওড়িশা থেকে নয়, বেঙ্গল থেকে বলতেই প্রশ্ন, তুমি কখনও পুরী গেছো? শ্রীমতী পাল বললেন আমি তো বছরে একবার করে পুরী যাই, তবে এই ভদ্রলোক যান প্রতিমাসে। এবার তিনি শ্রীমতী পালকে ছেড়ে আমাকে ধরলেন। শোনো! আমরা হলুম গিয়ে বালিদ্বীপের হিন্দু, তুমি টাকা নিয়ে যাও, যখন পুরী যাবে আমার নামে একটা পুজো দিয়ে দিও তো! আমি পড়লাম ফাঁপরে! পুরী মন্দিরের পূজা মহার্ঘ, সোয়া পাঁচ আনা বা ষোল আনার মামলা নয়; হাজার চার-পাঁচের মোকদ্দমা। একটি অচেনা অজানা লোকের কাছ থেকে হুট করে অতগুলো টাকা নিয়ে নেওয়া সমীচীন নয়, বিশেষত তাকে যখন প্রসাদ পাঠাতে পারব না। বললাম তুমি চিন্তা করো না, একটা কাগজে নাম গোত্র লিখে দাও; তোমার পূজা আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেব, দিয়ে তোমাকে জানিয়েও দেবো। তিনি নাম গোত্র লিখে দিলেন। গোত্র দেখলাম alyamba – খুব সম্ভবত আলম্বায়ন এর অপভ্রংশ। আর দিলেন ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা। সারাদিন ঘুরে, বিস্তর হেঁটে ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন অর্থাৎ পাঁচ তারিখে সকালে Wat Thmey Buddhist Monastery. এটি একই সঙ্গে মন্দির ও প্রদর্শনীকক্ষ। গিয়ে দেখি সেখানে এক হবু দম্পতির প্রি ওয়েডিং ফটো শ্যুট হচ্ছে। কাম্বোডিয়াতে বিবাহ মাত্রেই অ্যারেঞ্জড, এবং বিয়ে

মেয়ের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকতে যায়; কন্যার পিতামাতার সম্পত্তিতে তার অধিকার জন্মায়। এর মধ্যে কেউই কোন অশালীনতা বা রাজনৈতিক অশুদ্ধতা খুঁজে পান না; অর্থনীতির সহজ শর্তটি মেনে নেন; বাঙালি অকালবিপ্লবীদের মত এ নিয়ে পাড়া মাথায় করেন না। যেমন এই মেয়েটি নিজমুখেই বলল তার বিয়ের জন্য তার বাবা পাত্রের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা) নিয়েছেন। শুনে শ্রীমতী পাল লাফিয়ে উঠলেন, তোমার ফরেক্স কার্ডে কত ব্যালান্স আছে; তোমার ক্রেডিট কার্ডের লিমিট কত; তোমার কাছে নগদে কত ডলার আছে? তুমি এদেশেই থেকে যাও – রাজত্ব থেকে রাজকন্যা সবই পাবে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯, কাম্বোডিয়ার ক্ষমতাসীন কিমাইর রুজ সরকার কাম্বোডিয়াকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েক শতক। শহর খালি করে লোকজনকে পাঠানো হয়েছিল গ্রামে, পরিবার থেকে প্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন করে নতুন করে তাদের পরিবার দেওয়া হয়েছিল; কারণ কিমাইর রুজ কম্যুনিস্টদের মনে হয়েছিল শহর মানেই পুঁজিবাদের গোলকধাঁধা। তাই আদর্শ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের জন্য গ্রামে ফিরে যাওয়া, নির্বিচার গণহত্যা এবং প্রতিটি পরিবার ভেঙে সেই সদস্যদের নিয়ে নতুন পরিবার গঠনই নতুন সমাজের উদগাতা হতে পারে। কম খরচে মানুষ মারার পন্থাপদ্ধতি উদ্ভাবনে কিমাইর রুজ বাহিনীর সৃষ্টিশীলতা অপরিসীম - প্লাস্টিক প্যাকেট, হাতুড়ি, বাঁশ, কী নয়। তাই কাম্বোডিয়ার দু হাজার বছরের ইতিহাস মুছে ফেলে ১৯৭৫ সালকে শূন্য বছর ধরে নতুন করে বর্ষগণনা শুরু হয়েছিল। দু মিলিয়ন মানুষ, কাম্বোডিয়ার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ চার বছরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং এটি ঘটিয়েছিল নিজের দেশেরই লোক, আক্রমণকারী কোনও বিদেশি সেনাবাহিনি নয়। আমরা তো অমিতাভ ঘোষের ড্যান্সিং ইন কাম্বোডিয়া অ্যান্ড অ্যাট লার্জ ইন বার্মা পড়েছি। ১৯৭৯-তে ভিয়েতনামি বাহিনি গিয়ে এই বাঁদরামোর ইতি ঘটায়। Wat Thmey Buddhist Monastery-র ভিতরে গণহত্যায় মৃত এইসব মানুষদের দেহাবশেষ সংরক্ষিত আছে, আছে স্মৃতিমন্দির। যেহেতু কাম্বোডিয়ার সব পরিবারই এই নির্বোধ সাম্যবাদীদের কবলে কোন না কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, পরিবারে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে তারা এখানে আসেন।

আমাদের যখন ভিয়েতনাম যাওয়ার সব ঠিকঠাক, জননী বললেন হ্যাঁরে, লোকের বাড়ি কি খালিহাতে যাওয়া যায়? আমি পড়লাম বিপদে। ভিয়েতনাম নিয়ে আমার জননীর আবেগ আমি অন্তত বুঝি। ১৯৬৩-তে আমরা দুজনে যখন ভিয়েতনাম যাই, তিনি একুশ, আমি চার। নিম্ন-মধ্যবিত্ত, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে নিম্নবিত্ত, বাড়ির মেয়ের একাকিনী বিদেশযাত্রা, সেই যুগে উড়োজাহাজ চেপে, পাসপোর্ট ভিসা করিয়ে, দু দিকের প্রগাঢ় রক্ষণশীল যৌথ পরিবারের বাধা পেরিয়ে; সে এক অযাচিত বিপ্লব। মা তখন যদি তার সেই বিমানযাত্রার কথা, দুধের বোতল দিয়ে লুচি বেলার কথা, সামরিক অভ্যুত্থানের কথা, জীবিকার সর্বস্তরে মহিলাদের বিস্তৃত প্রাধান্যের কথা (এখানে তখন 'মহানগর' এর যুগ, রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আরতি মজুমদার বাড়ির অমতে চাকরি করতে গিয়ে তার নবলব্ধ আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতা অর্জন ও উপভোগ করেন; সুব্রত মজুমদার চাকরি হারালে আরতিই কিভাবে বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ে ওঠেন – তাই নিয়েই বাঙালির দিগন্ত) লিখে রাখতেন, আমি নিশ্চিত, দময়ন্তীদির সংকলনে তার জায়গা হত। পরে যখন বড় হয়েছি, আমার জননীই লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে বলেছেন সীতা কেন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা ছেড়ে রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভিয়েতনাম গিয়ে। সেই মানুষটি যদি দূরের সেই দেশটিকে আত্মীয়সম ভেবে থাকেন, মনে করে থাকেন যে আত্মীয় কুটুম্বজনের বাড়ি খালি হাতে যাতায়াত অশোভন, তাহলে আমি কিছু বলার কে? সে না হয় যাওয়ার সময় কিছু উপহারসামগ্রী কিনে নিয়ে যাওয়া গেল। কিন্তু দেবো কাকে? সেই সময়ের কে আছেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? মা বললেন যাকে হয় দিবি; রাস্তার লোককে, হোটেলের পরিচারককে, দোকানদারকে – তবে দিবি। আর জানেনই তো আমি আবার খুব মাতৃভক্ত। সেটা ভক্তিতে নয়, ভয়ে। জীবনে যতবারই মার পরামর্শের বিপ্রতীপে গিয়ে কিছু করতে গেছি, ফেলে ছড়িয়েছি, কেস খেয়েছি। কাশীরাম দাস তো সেই কোনকালেই যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বলিয়েছেন 'লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী। মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি।। মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি। মাতার বচন আমি দেবতুল্য মানি'।। সাকুল্যে গুটিবিশেক উপহারসামগ্রী নেওয়া হল - সবই অতি সস্তার, তার মধ্যে আছে বাঁকুড়ার বিকনার ঢোকরার ছোট মূর্তি, কটকের রুপোর ফিলিগ্রির গহনা, গড়িয়াহাটের ফুটপাথের চটের ব্যাগ, নতুনগ্রামের প্যাঁচা। মাতৃবাক্য কি আর মিথ্যা হয়! ভিয়েতনামে গিয়ে দেখা গেল জননীর আইডিয়াটি যাকে বলে স্ল্যাশ হিট। দোকানের বিক্রয়বালিকাটিকে শ্রীমতী পাল একটি রুপোর গহনা দিলে, বা হ্যানয়ে আমাদের স্থানীয় গাইডটিকে একটি চটের ব্যাগ দিলে, বা প্রি ওয়েডিং ফটো শুট করতে আসা হবু দম্পতিকে একটি ঢোকরার হাতি দিলে - তারা যে কী খুশি হয় বলবার নয়। জড়িয়ে ধরে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে জেসমিন টি, লোটাস টি, সিত্রাস টি খাওয়ায়। বিয়ের কনে তো বলল শুভকাজে হাতি উপহার পাওয়াটা অতীব শুভলক্ষণ; কারণ কপিলাবস্তু নগরীতে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সাদা হস্তী মেঘের ওপর দিয়ে এসে তার শুড়ের শ্বেতপদ্মটি রানির কোলে এনে দিল।

তারপর কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই; সারা দিনটা আছে আমাদের নিজেদের ইচ্ছামত শহরটি ঘুরে দেখার জন্য – আর যার যা করতে ভাল লাগে তাই করার জন্য। আমাদের স্থানীয় গাইড ছিলেন শরথ নামের এক কাম্বোডিয়ান যুবক। সে বৌদ্ধ, তবে তার সেলফোনের রিংটোন 'জয় গণেশ, জয় গণেশ, জয় গণেশ দেবা'। সে বলল কেনাকাটা কিছু করার থাকলে এখান থেকে করে নাও; সায়গনে দাম অনেক বেশি পড়বে।

তথাস্তু! তদনুযায়ী আমরা গেলাম শহরের পুরনো বাজার এলাকায়। স্বচ্ছতোয়া সিয়েম রিপ নদী সেখানে বয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আড়ে বহরে গড়চুমুকের কাছের দামোদর, আর তার উপর অগণন সেতু – নদীর দুপারে বিস্তীর্ণ মাঠ, সেখানে বসার বেঞ্চি, নানাবিধ আহার্যের সম্ভার, কেউ মধুতে ডুবিয়ে জ্যান্ত মৌমাছি খাচ্ছে তো কেউ বিট নুন ছিটিয়ে কাঁচা ঝিনুক, মিলছে সাপ ও কুকুর, ইঁদুর ও শূয়র। বোঝা গেলো এটা শহরের লোকেদের বেড়াবার জায়গা। নদীটিকে দেখে বুকের ভিতর থেকে এক পুকুর দুঃখ উঠে এল যেন! আমরাও তো আমাদের নদীগুলিকে এমন করে ধরে রাখতে পারতাম - কেন চুরি হয়ে গেল সোনাই আর নোয়াই, কোথায় গেল অচলা নদী (ধাত্রীগ্রাম), গাঙুর নদী (গলসী), বেহুলা নদী (কালনা), বেহুলা নদী (পুরাতন মালদহ), সরস্বতী নদী (হাওড়া), মণি খাল (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা)? জঞ্জাল আর প্লাস্টিক ফেলে, জলধারার মধ্যে থেকে পিলার তুলে দোকানঘর বানিয়ে স্রোত রুদ্ধ করে আমরা তাদের পাঠিয়ে দিলাম না ফেরার পথে!

নদীর দুপারের মাঠ পেরিয়ে রাস্তা, পশ্চিমের রাস্তাটির নাম পোকাম্বোর এভিনিউ; তার পাড়ে কাম্বোডিয়ার রাজার রয়্যাল রেসিডেন্স, রাজামশাই সিয়েম রিপে এলে এখানে থাকতেন, এখন এটি হোটেল। সন্নিহিত রাস্তাটির নাম Charles de Gaulle। নদীর পূর্ব পাড়ের রাস্তাটির নাম Achar Sva Street। Pokambor Avenue এবং Achar Sva Street – দুটি রাস্তা বরাবর দোকানপাট; দুটি রাস্তা থেকেই ঢুকে গেছে অসংখ্য গলি, তাদেরও দুপাশে দোকানপাট; দোকানগুলিতে ঠাসা কাম্বোডিয়ার প্রথাগত শপিং আইটেমস – পাথরের ও ধাতব বুদ্ধমূর্তি, গণেশমূর্তি, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন মূর্তি, আঙ্করভাট মন্দিরের মডেল; বেতের বোনা জিনিসপত্র, সুপারি দিয়ে তৈরি বাক্স ও খেলনা, জামাকাপড়, রুপো ও রঙিন পাথরের গহনা, রেশমের স্কার্ফ, কাঠখোদাই মূর্তি – বিশেষত অপ্সরার – ঘরে যা রাখলে সৌভাগ্যলাভ সুনিশ্চিত, ধূপের মোটা মোটা বান্ডিল – এরা ঠাকুরের সামনে আমাদের মত পাঁচ দশটা ধূপ জ্বালায় না, শয়ে শয়ে জ্বালায়, সুগন্ধি ধোঁয়ায় ভরিয়ে দেয়, রাইস পেপার ইত্যাদি। এক জায়গায় কাম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজছিল। তার সুর অনেকটাই আকাশবাণীর মহালয়ার মত। কান খাড়া করে শুনতে তার মধ্যে অনেকগুলি বাংলা শব্দ শোনা গেল। রক্ষা, মহা, মঙ্গল ইত্যাদি; যদিও গানটি কিমাইর ভাষায়।

ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ায় বেড়াতে গেলে পর্যটকরা প্রথাগতভাবে যা যা কেনেন, যথা Áo dài পোশাক, Lacquer Painting, সূক্ষ্ম সুতোর কাজকরা ব্যাগ বা টুপি, কাঠের খেলনা - তা আমরা হ্যানয় থেকেই কিনে নিয়েছিলাম - বাকি ছিল সুবিস্তৃত আত্মীয়কুলের সদস্যদের জন্য স্মারক কেনা। ভেবেচিন্তে ঠিক হল, সবার জন্যই চিত্রিত টি শার্ট কেনা হবে। একটি দোকানে যাওয়া হল। ও মা! বিক্রয়বালিকাটি বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না। তারপর দেখা গেল সব দোকানেই ওই অবস্থা! একটি মেয়ে শ্রীমতী পালকে প্রায় হাইজ্যাক করে তার দোকানে ঢুকিয়ে নিল।

আমরা টি শার্ট দেখতে লাগলাম, অনেকগুলি কিনতে হবে, প্রায় বাইশ পঁচিশটি। একটি পছন্দ করে মেয়েটিকে দেখালাম, সে ত্বরিতে ক্যালকুলেটরে পঁচিশ লিখে এক মার্কিন ডলারের একটি নোট বার করে দেখিয়ে দিলো। বুঝলাম পঁচিশ মার্কিন ডলার! অবিশ্বাস্য! কিন্তু ওরা তো আর জানে না যে আমরা গড়িয়াহাটের ফুটপাথে বাজার করা লোক! শ্রীমতী পাল তাকে দুটি আঙ্গুল দেখালেন, অর্থাৎ দু মার্কিন ডলারে হবে? মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ক্যালকুলেটরে পাঁচ লিখে দেখিয়ে দিলো। এভাবে অনেকক্ষণ চললো। শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি টি শার্ট, রেশমের স্কার্ফ, কাঠ খোদাই অপ্সরা, রঙিন পাথর নিয়ে আমাদের দেয় হল আশি মার্কিন ডলার। তাই দিয়ে বিজয়গর্বে পিছন ফিরেছি, মেয়েটি বলল 'মাই টিপস'!
আকাশ থেকে পড়লাম! এ কোন দেশে এলাম গো! দোকানদার টিপস চায়। কিন্তু সে শ্রীমতী পালের আঁচল ধরে রেখেছে,

সেদিন সন্ধ্যাটা ফাঁকা ছিল। আমরা রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেহেঁটে বিস্তর ঘুরলাম। গণেশমন্দিরে পূজা দিলাম, আর স্ট্রিট ফুড খেলাম। অতীতে যাই থেকে থাকুক না কেন, বর্তমানে কাম্বোডিয়ার জনসংখ্যার আটানব্বই শতাংশ মানুষ থেরাবাদী বৌদ্ধ। থেরাবাদী লিখলাম কারন হীনযান শব্দটি আজকাল আর প্রচলিত নয়। থেরাবাদীদের চরম লক্ষ্য অর্হৎত্ব প্রাপ্তি, অর্থাৎ প্রকৃত ভিক্ষু হয়ে ওঠা; ও পরিণামে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। জন্মান্তর বাদ বা কর্মফলের ধারণা এদেশে বহুল ব্যাপ্ত। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯, কিমায়র রুজ শাসনকালে সকল ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ ছিল; তাতে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৭৯তে ওই সরকারের পতনের পর বর্ষার জল পেয়ে গ্রীষ্মের শুকনো ঘাসের সঞ্জীবিত হওয়ার মতন, ধর্মাচরণ ফিরে এসেছে হইহই করে।

এঁদের আরাধ্য দেবদেবীদের মধ্যে আছেন পঞ্চ বোধিসত্ত্ব – অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, ক্ষিতিগর্ভ, মহাস্থমপ্রাপ্ত ও সামন্তভদ্র; পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ - বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য - এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধর পঞ্চশক্তি তারা, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। তবে প্রধানতম অবশ্যই হাসিখুশি মোটাসোটা টেকো চৈনিক হাস্যরত বুদ্ধ (Laughing Buddha, Hotei, Pu-Tai)। ইনি স্নেহশীল, দুঃখহর ও বাৎসল্যরসে পূর্ণ, সৌভাগ্য, প্রাচুর্য ও শান্তি প্রদায়ী। এনার হাতে রেশমের ঝোলা, সেটি সর্বদাই ধানচারা (সমৃদ্ধির প্রতীক), ভালো ভালো খাবার জিনিস, চকলেট লেবেঞ্চুস কিসমিস বাদামে পরিপূর্ণ। শিশু, প্রবীণ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্রদের প্রতি তার মমতা অসীম; তিনি ভোজনস্থানসমূহের রক্ষাকর্তা। কখনও তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র, কখনও তার পাশে ছেলেপিলের দল, কখনও তাঁর হাতে পাখা, কখনও বা তিনি টানাগাড়িতে সমাসীন। ইনি বোধিসত্ত্বের এক রূপ, শেষের সেই দিনে ইনিই আসবেন মৈত্রেয় নাম নিয়ে। এঁর সঙ্গে দেহগত সাদৃশ্যের কারণেই হোক, বা হস্তী সংযোগের কারণেই হোক, (গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে মায়াদেবী শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখেছিলেন); আমাদের পাড়ার গণেশদাদাও দেখলাম এদেশে তুমুল জনপ্রিয়। ক্ষুদ্রতম ইঁদুর ও বৃহত্তম হাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতীক এই গণেশ; জানালেন আমাদের হোটেলের এক দিদি।

পরদিন অর্থাৎ ছ তারিখে হোটেল (Angkor Holiday Hotel Sivatha Rd, Krong Siem Reap, Cambodia) ছেড়ে বিমানবন্দর। Cambodia Angkor Airlines এর উড়ান VN 3818, Airbus 320, XU 356, সায়গনে নামলাম সাতান্ন বছর পর।

~ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ~

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাবে

তাঞ্জানিয়ার ওল্ডুভাই গর্জ

দেবযানী চক্রবর্তী

আরুশা - সেরেঙ্গেটির কাছাকাছি তাঞ্জানিয়ার একটি ব্যস্ততম শহর, গ্রেট রিফট ভ্যালির পূর্ব শাখার পূর্বপ্রান্তে 'মেরু' পর্বতের নিচে অবস্থিত। অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পর্যটকদের বিচরণভূমি। এখানে থেকে ঘোরা যায় নর্দান সাফারি সার্কিট, সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক, কিলিমাঞ্জারো ন্যাশনাল পার্ক, এনগোরোঙ্গোরো (Ngorongoro) কনজারভেশন এরিয়া, আরুশা ন্যাশনাল পার্ক, লেক মানিয়ারা ন্যাশনাল পার্ক এবং ত্যারাঞ্জিরে ন্যাশনাল পার্কসহ আফ্রিকার সেরা কিছু জাতীয় উদ্যান। 'মাসাই' নামে পরিচিত স্থানীয় জনগণের 'মা' ভাষায় সেরেঙ্গেটি (Serengeti)-র অর্থ "অন্তহীন সমভূমি"। ১৯৮১ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয় এই 'আনটাচড আফ্রিকান ওয়াইল্ডারনেস হোয়্যার টাইম স্ট্যান্ডস স্টিল'। প্রায় ১৫,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে কুড়ি লক্ষেরও বেশি আনগুলেট (ungulates) বা খুরওলা স্তন্যপায়ী, চার হাজার সিংহ, এক হাজার চিতাবাঘ, পাঁচশ পঞ্চাশটি চিতা এবং পাঁচশটিরও বেশি পাখির প্রজাতি বসবাস করে। ট্যুরিজমই আরুশা শহরের অর্থনীতির একটি প্রধান অংশ এবং তাঞ্জানিয়ার বৃহত্তম ডলার উপার্জনকারী অর্থনৈতিক খাত।

২০২১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ব্রতীনের সঙ্গে দার এস সালাম থেকে আবার এসে উপস্থিত হয়েছিলাম আরুশাতে। ভ্রমণপিপাসু মন - নতুন কিছু দেখবার বা জানবার আগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি দেশবিদেশের নানান স্থানে যখনই সুযোগ পাই। এবারের উদ্দেশ্য ছিল এই শহরকে কেন্দ্র করে ঘুরে নেব তাঞ্জানিয়ার ওল্ডুভাই গর্জ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি স্বর্গরাজ্য যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যালিওনথ্রোপলজিক্যাল সাইটগুলির মধ্যে একটি। বিগত কুড়ি লক্ষ বছরে মানুষের জৈবিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং প্রাথমিক মানব বিবর্তনের জীবাশ্মনিদর্শন। এরই সঙ্গে দেখে নেব চলমান কালো বালিয়াড়ি-টিলা (Shifting sand black dune)।

দুমাস আগে এই আরুশাতে প্রথম এসে উপভোগ করে গিয়েছি সেরেঙ্গেটির জঙ্গলে অবস্থিত বন্য হাতির ছোটাছুটি, সিংহের রাজকীয় বিচরণ। গাড়িতে বসেই সেইসময় মুখোমুখি হয়েছিলাম দলছুট এক বন্য হাতির, আর দেখতে পেয়েছিলাম শিকার করে আনা একটি জেব্রাকে ঘিরে সিংহদের ভোজনের দৃশ্য। দিনের সাফারির থেকে বেশি আনন্দ পেয়েছি জঙ্গলের মাঝে

সিংহের গর্জন, চারপাশে বন্যজন্তুদের পদধ্বনি। অন্ধকার জঙ্গলে দেখেছিলাম আগুনের গোলার মতো জ্বল জ্বল করছে তাদের চোখগুলো। রাতের আঁধারে জঙ্গলের এক অপূর্ব রূপ রয়েছে সেটা সেবার উপলব্ধি করেছি এখানে এসে। এ শুধু মনেতে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। আগের ভ্রমণের এইসব স্মৃতি মনে নিয়েই আমরা এবার আবার এসেছি আরুশাতে - ওল্ডুভাই গর্জ যাকে সভ্যতার ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে 'দ্য ক্র্যাডেল অফ হিউম্যানকাইন্ড' আর চলমান কালো বালিয়াড়ি টিলা দেখতে।

পরের দিন খুব সকাল সকাল আরুশা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ওল্ডুভাই গর্জ (Olduvai Gorge)-এর উদ্দেশে। সুন্দর পরিষ্কার রাস্তা। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা চলার পর গাড়ি এসে থামল এনগোরোঙ্গোরো কনজারভেশন এরিয়া এবং সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের সংযোগস্থলে। এখান থেকে রাস্তা একদিকে চলে গিয়েছে ওল্ডুভাই গর্জের দিকে, অপর দিকের পথ ধরে এগিয়ে গেলে পৌঁছানো যাবে চলমান কালো বালিয়াড়ি টিলাতে। ইঞ্জিনিয়ার জশুয়া এমোয়ানকুন্ডা এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়টিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে সেইমতো এখানে একটি মনুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল যা পর্যটকদের কাছে সাইনপোস্ট হিসাবেও কাজ করে আসছে।

বিরাট এক পেডেস্টালের ওপরে বসানো আছে জীবাশ্ম খুলির দুটি বিশালকায় মডেল। বাঁদিকের খুলিটি প্যারানথ্রপাস বোয়েসি(Paranthropus boisei)-র (পূর্বে জিনজানথ্রপাস বলা হত)। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল আধুনিক মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ডানদিকেরটি হোমো হ্যাবিলিস (Homo Habilis) বা হ্যান্ডি ম্যান)-এর। আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয় এদের। বৃহত্তর মস্তিষ্কের অধিকারী ছিল তারা। পাশেই লাগানো রয়েছে একটি তথ্যপূর্ণ ফলক। তাঞ্জানিয়া সরকারের অনুরোধে জীবাশ্মবিদ নিকোলাস টথ, ক্যাথি স্চিক এবং জ্যাকসন এঞ্জাউ এটির পরিকল্পনা করেছিলেন এবং কংক্রিটের এই বৃহদাকার খুলিদুটি নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত তাঞ্জানিয়ান শিল্পী ফেস্টো কিজো । স্মৃতিস্তম্ভ থেকে ৫ কিমি দূরে অবস্থিত ওল্ডুভাই গর্জ মিউজিয়াম আর প্রধান গিরিখাতটা। পথটি বলতে গেলে সেরেঙ্গেটি জঙ্গলেরই একটি অংশে অবস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হলাম সুন্দর একটি প্রবেশদ্বারের কাছে। কাছেই ওল্ডুভাই গর্জ মিউজিয়াম, যেটিকে আফ্রিকার বৃহত্তম অনসাইট জাদুঘরগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে রয়েছে হোমিনিড এবং প্রাণীজ জীবাশ্মের অসাধারণ সংগ্রহ, সেইসঙ্গে প্রাচীন সরঞ্জামগুলি যাদের এখন ওল্ডোয়ান (ওল্ডুভাই গর্জ থেকেই এই নামকরণ) থেকে নেওয়া হয়েছে) হিসাবে উল্লেখ করা হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীনতম পরিচিত পাথরের সরঞ্জাম শিল্পের প্রতিনিধি এগুলি। এছাড়াও রয়েছে কাস্টিং-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নানা জীবাশ্ম, যার মধ্যে আছে আদিম হোমিনিড খুলিগুলিও। রক্ষিত করা রয়েছে দ্য লিতোলি ফুটপ্রিন্টস (Laetoli Footprints)-এর প্রকাণ্ড কাস্ট, আর এই খনন এলাকায় একেবারে গোড়ার দিকে কর্মরত লিকি পরিবারের বেশ কয়েকটি ছবি।

স্টোন এজ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড জন টেম্পটেশন ফাউন্ডেশন-এর অর্থানুকূল্যে স্থাপিত এই প্রকল্পের অংশীদার এনগোরোংগোরো কনজারভেশন এরিয়া অথরিটি ।

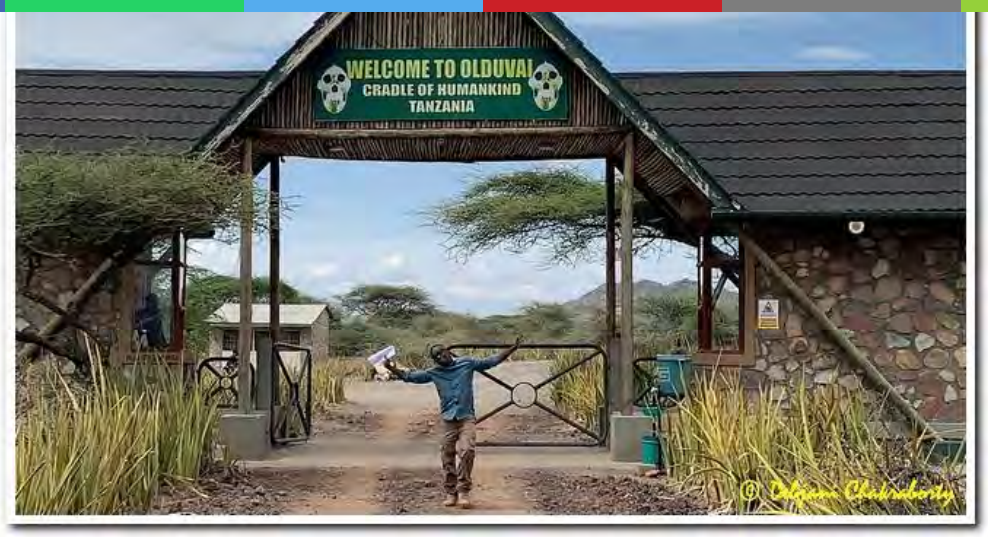

এখানে খনন করে মানবজাতির বিবর্তনের ভিত্তিতে মানব বসতির পাঁচটি স্বতন্ত্র স্তর পাওয়া গিয়েছে। হোমো হ্যাবিলিস বা হ্যান্ডি ম্যান বিবেচিত হয়েছে সম্ভবত প্রথম মানব প্রজাতি হিসাবে।এযাবৎ বৃহত্তম মস্তিষ্কবিশিষ্ট আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স-এর পূর্বপুরুষ । এরা ছিল বৃহত্তর আকারের মস্তিষ্কবিশিষ্ট আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। ওল্ডুভাই গর্জে প্রাথমিক 'ওল্ডোয়ান' পাথরের হাতিয়ারের প্রধান নির্মাতা বলে মনে করা হয় এদের। তারপরে প্যারানথ্রপাস বোয়েসি (Paranthropus boisei) বা নাটক্র্যাকার ম্যান। প্রায় ১৪ লক্ষ বছর আগে এই বংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। এদেরই একটি মাথার খুলি ১৯৫৯ সালে মেরি লিকি ওল্ডুভাই গর্জ-এ আবিষ্কার করেছিলেন। বিবর্তনের ধারা বেয়ে এরপর আসে হোমো ইরেক্টাস (Homo erectus), লাতিন ভাষায় অর্থ 'উন্নত মানব'। সম্ভবত আফ্রিকাতেই হোমো ইরেক্টাসের উৎপত্তি হয়েছিল, তবে ইউরেশিয়াকেও এই ব্যাপারে বাতিল করা যায় না। তবে আনুমানিক ১৭ লক্ষ বছর আগে এই প্রজাতির সদস্যরা যে আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছিল সে বিষয়ে গবেষকরা একমত। এরা ছিল মাঝারি উচ্চতার এই আদিমানুষকে 'ইরেক্ট' বলার কারণ হল এরা দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। মাথার খুলিটি অবনত, কপাল একটু পেছনের দিকে হেলানো, নাক, চোয়ালও তালু প্রশস্ত। আধুনিক মানুষের তুলনায় এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল কম কিন্তু দাঁতের দৈর্ঘ্য বেশি। অনুমান করা হয় যে প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে এরা বিলুপ্ত হয়ে আজকের মানুষ হোমো সেপিয়েন্সদের (Homo sapiens) জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তবে আফ্রিকার যে কোন প্রজাতিই হোক, এরা কিন্তু সবাই ১৭,০০০ বছর আগের থেকেই গর্জের জায়গা দখল করেছিল বলে মনে করা হয়।

ওল্ডুভাই গর্জে বা গিরিখাতে সাধারণ-এর নামা নিষিদ্ধ। ওপর থেকে দাঁড়িয়েই পর্যটকরা দেখে নেন। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে সিসাল নামে একপ্রকার বন্য উদ্ভিদ প্রচুর দেখা যেত। এই সিসালকেই এখানকার আদিবাসী মাসাইদের ভাষায় বলা হয় গর্জ। পর্যটকদেরকে গাইড জানিয়ে দেন কী করে এই ওল্ডুভাই গর্জ গঠিত হয়েছিল – এনদুতু হ্রদ থেকে এনগোরোংগোরোর পাদদেশের ওলবালবাল নিম্নভূমিতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বয়ে আসা জলধারার চাপে ভূমিক্ষয়ের ফল এই গভীরভাবে ছেদিত উপত্যকা। ওল্ডুভাই গর্জের খননকার্য চলাকালীন কাজের সুবিধার জন্য অঞ্চলটিকে কতকগুলো ধাপ বা বেড-এ চিহ্নিত করা হয়েছে। ১নং বেড থেকে ৪নং বেডে পাওয়া গিয়েছে ওল্ডোয়ান টুলসগুলি বা বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম। বেড নং ১-এ রয়েছে ১.৮৫ মিলিয়ন বছর থেকে ১.৭ মিলিয়ন বছর আগের ওল্ডোয়ান টুলস ও প্যারানথ্রপাস বোয়েসির জীবাশ্ম। ১.৭ থেকে ১.২ মিলিয়ন বছর আগের হোমো হ্যাবিলিসের জীবাশ্ম রয়েছে বেড নং ২-এ। প্রায় ১.৬ মিলিয়ন বছর আগের হোমো হ্যাবিলিসরা পথ ছেড়ে দিয়েছিল হোমো ইরেক্টাসদের। কিন্তু প্যারানথ্রপাস বোয়েসিরা তখনও ছিল এই অঞ্চলে। ৮০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ বছর আগে ব্যবহৃত ওল্ডোওয়ান সরঞ্জামগুলি বেড নং ৪-এ পাওয়া

করার পদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিল।

দূরে দৃশ্যমান নাইবোর সোইট পাহাড়ের (Naibor Soit hills) সঙ্গে ওল্ডুভাই গর্জের ক্লাসিক রম্যাণী দৃশ্যাবলী ভ্রমণপিপাসুদের মনে এনে দেয় এক অফুরন্ত তৃপ্তি। সামনেই ৩ নং বেডের লাল পলি দিয়ে তৈরি এক মনোলিথের দৃশ্য, আকৃতির দরুণ যা "ক্যাসল" (Castle) নামে পরিচিত। গর্জের এই অতুলনীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা যায় না, শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। দিনান্তে এই নিস্তব্ধ গিরিখাতের স্মৃতির রেশ সঙ্গে নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম কাছেই অবস্থিত চলমান কালো বালিয়াড়ি টিলার উদ্দেশ্যে। তখন প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলের স্বর্গরাজ্য ওল্ডুভাই গর্জ আফ্রিকান সূর্যের কমলা আভায় এক অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে।

অনুবাদ - অতীন চক্রবর্তী

মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক দেবযানী চক্রবর্তীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল শহরে। বিবাহের পর স্বামীর কর্মক্ষেত্রের সুবাদে দেশ-বিদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে সজীব হয়েছে তাঁর ভ্রমণপিপাসু মন। পছন্দ করেন বনে-জঙ্গলে বন্য পশুদের বিচরণক্ষেত্রে সময় কাটাতে, এছাড়া মানব বিবর্তনের ইতিহাস আর প্রাচীন ভগ্নস্তূপের কাহিনির খোঁজ নিতে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেও ভালোবাসেন খুব।

Comments

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

তুমলিং – সাধ ও সাধ্যের ট্রেকিং

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

'হাঁটুতে আজ টান লেগেছে', তাই ইচ্ছে থাকলেও ৫০+ বয়সে পাহাড়ের পথে পথে হেঁটে বেড়ানো যখন ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে তখন মাথায় এল একটা ছোট্ট ট্রেকিং রুটের কথা। এমনিতেই রডোডেনড্রন বাঙালির আবেগ। বছর দশেক আগে বারসে গিয়ে নেশা ধরে গিয়েছিল। সঙ্গে আছে বাঙালির প্রথম পছন্দের সান্দাকফু। কিন্তু এখন গাড়ির রাস্তা হয়ে ভিড় বেড়েছে, হারিয়েছে সেই নির্জনতা। একটু সমঝোতার পথে হাঁটলাম, ঠিক করলাম গাড়িতে তুমলিং গিয়ে সেখান থেকে ট্রেক করে ধোতরে হয়ে ফিরব। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, কাজেই রডোডেনড্রন পাওয়ার আশা ষোলোর জায়গায় আঠারো আনা। সেই মত দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম।

সকালে নিউ জলপাইগুড়ি নেমে গাড়িতে মানেভঞ্জন। এবার একটা বোলেরো নিয়ে তুমলিং-এর পথে। এখন সান্দাকফুর রাস্তা অনেকটাই কংক্রিট বাঁধানো, তবে প্রচন্ড খাড়াই। বুনো শুয়োরের মত ঘোঁতঘোঁত করতে করতে গাড়ি পৌঁছাল তুমলিং।

তুমলিং-এ শিখর লজ বুক করাই ছিল। ঘরে ঢুকে মালপত্তর রেখেই আবার বেরোলাম, উপায় নেই, বাইরে যে রঙের রায়ট, তাকে এড়াবো কীভাবে!

অধিকাংশ ট্যুরিস্ট কোনোরকমে একটা রাত তুমলিং-এ কাটিয়ে দৌড়োয় সান্দাকফুর দিকে, সে গাড়িতেই হোক আর সামান্য কয়েকজন যারা এখনও হাঁটেন। খুব তাড়া না থাকলে একটা দিন বরাদ্দ করুন তুমলিং-এর জন্য। সামান্য কয়েকটা হোটেল বা হোমস্টে, সামনে মস্ত এক অজগরের মত বিছিয়ে আছে রাস্তা, সামনে উঠে গেছে গৈরিবাসের দিকে, পিছনেও চড়াই, টংলু। সামনে তাকান, পিছনে ফিরুন, দৃশ্যপট পালটে যাবে। একটু হেঁটে চলে যান গৈরিবাসের দিকে, মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টাবে দৃশ্যপট। এগোন টংলুর দিকে, সে আরেক ছবি। আর দুপাশে রডোডেনড্রন তো স্বমহিমায় বিরাজমান। কপাল ভালো থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা দেবেন। এযাত্রা অবশ্য আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি, তবে রংবাহারি রডোডেনড্রন সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে।

সকালের লালচে আলোয় সে ছবি একরকম, সন্ধ্যের নরম আলোয় আরেকরকম। নরম রোদের মায়ায় আরও অন্যরকম। কখনও মেঘ ঝাপসা করে দিচ্ছে, আবার যেন ইরেজার বুলিয়ে কেউ তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। হাতের ক্যামেরা হাতেই থেকে যায়, লেন্সের সাধ্য কী এই মায়ার খেলাকে বন্দী করে। সঙ্গে অবিশ্রান্ত পাখির ডাক। আসলে এটা তো ওদেরই এলাকা, আমরা তো অনুপ্রবেশকারী।

কাল ট্রেক করে ধোতরে যাব, ৭ কিলোমিটার রাস্তা, পুরোটাই উৎরাই, তাই দমে টান ধরার আশংকা নেই। আগে এই রাস্তাতেই ধোতরে থেকে সান্দাকফুর পথে এসেছি, তাই জানি রাস্তা বেশ খাড়াই, তাই উৎরাই হলেও পায়ে চাপ পড়বেই। হোটেলে বলে রাখলাম একজন গাইড কাম পোর্টারের কথা। সঙ্গী আমার স্ত্রী, সেও ৫০+, কাজেই মোট বওয়া একটু কঠিন। একটু চিন্তা হচ্ছিলই, আসলে হাঁটু দুটো এখন বেশ কমজোরি, তবু ছুটে বেড়াই কোন এক অমোঘ আকর্ষণে।

সকালে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বেলা নটা নাগাদ রওনা হলাম ধোতরের পথে, সাথে বীরেন তামাং বলে একটি ছেলে। গতকালই কংক্রিট বাঁধানো পথে টংলু পর্যন্ত ঘুরে এসেছি, তাই বীরেনকে বললাম অন্য পথে যেতে। আসলে বছর পাঁচেক আগে এই পথেই উঠেছিলাম, সবুজে মোড়া তার স্মৃতি অটুট। আগের রাতের বৃষ্টির কারণে মাটি নরম, পথে সবুজ ঘাসের গালিচা চোখের আরাম। গোটা রাস্তাটাই নেপালের মধ্য দিয়ে। গাড়ির রাস্তা টংলুর পর থেকে পুরোটাই ভারত নেপাল সীমান্ত, কিন্তু এখানকার কোনও বাসিন্দাই এই নিয়ে কিছু ভাবেন না। প্রায় দেড় কিলোমিটার পর গাড়ির রাস্তা টপকে ধোতরের পথে পা দিলাম।

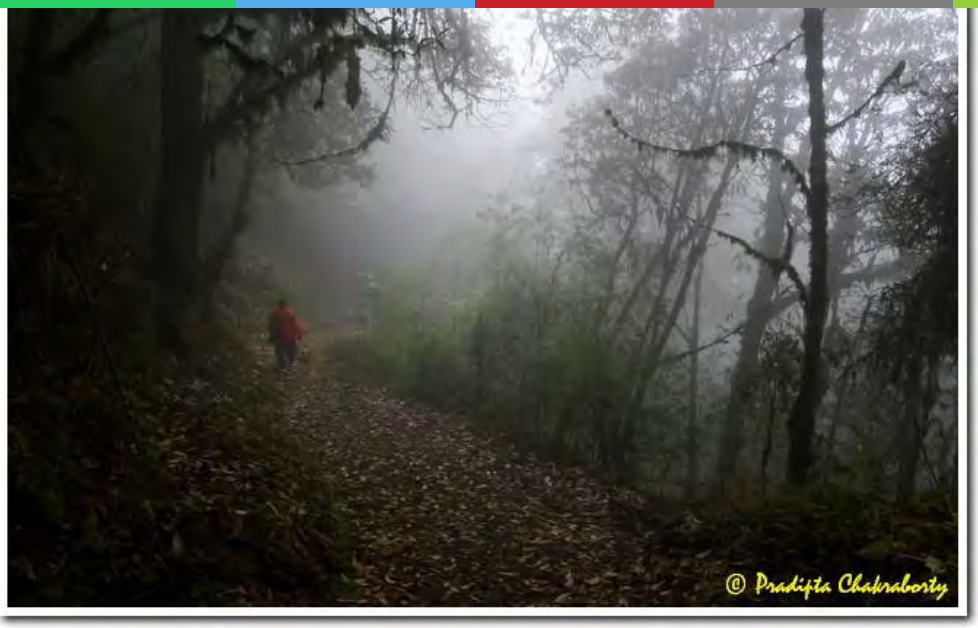

এক লহমায় বাকরুদ্ধ হওয়ায় মত অবস্থা। পথের দুধারে রডোডেনড্রন মেলা বসিয়েছে, কাল রাতের বৃষ্টিতে ঝরা ফুলের গালিচা। নীচু গাছের ডালেও ফুলের বাহার। চাইলে যেন একটু আদর করেও নেওয়া যায় ফুলের দঙ্গলকে। তবে ফুল দেখতে হচ্ছে সাবধানে। রাস্তা পাথুরে, অসমান এবড়োখেবড়ো। সাবধানে পা না ফেললে মচকানোর সমূহ সম্ভাবনা। উৎরাই পথে দমে টান না পড়লেও পায়ের আঙুলে যথেষ্ট চাপ। ২৫-৩০ মিটার পরেই মোড় নিচ্ছে। একবার শর্টকাট করতে গিয়ে যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। আসলে মন না মানলেও বয়স তো আর বসে নেই। মেঘ ঢুকে মাঝে মাঝেই পথ রহস্যাবৃত করে তুলছে। সব কিছু কেমন ঝাপসা, যেন ক্যানভাসে কেউ হঠাৎ করে খানিকটা সাদা রঙ ঢেলে দিচ্ছে। চোখে পড়ল সাদা রডোডেনড্রন যাকে স্থানীয়রা চিমাল বলে। বারসেতে দেখেছিলাম। এই পথে নাকি ভাল্লুক আর লাল পান্ডার আনাগোনা আছে। পান্ডার প্রিয় বাঁশের বন রয়েছে, যদিও তারা কেউই দেখা দিয়ে ধন্য করেননি। উৎরাই হলেও ৭ কিলোমিটার রাস্তা এই বয়সে ক্লান্তিকর বটেই।

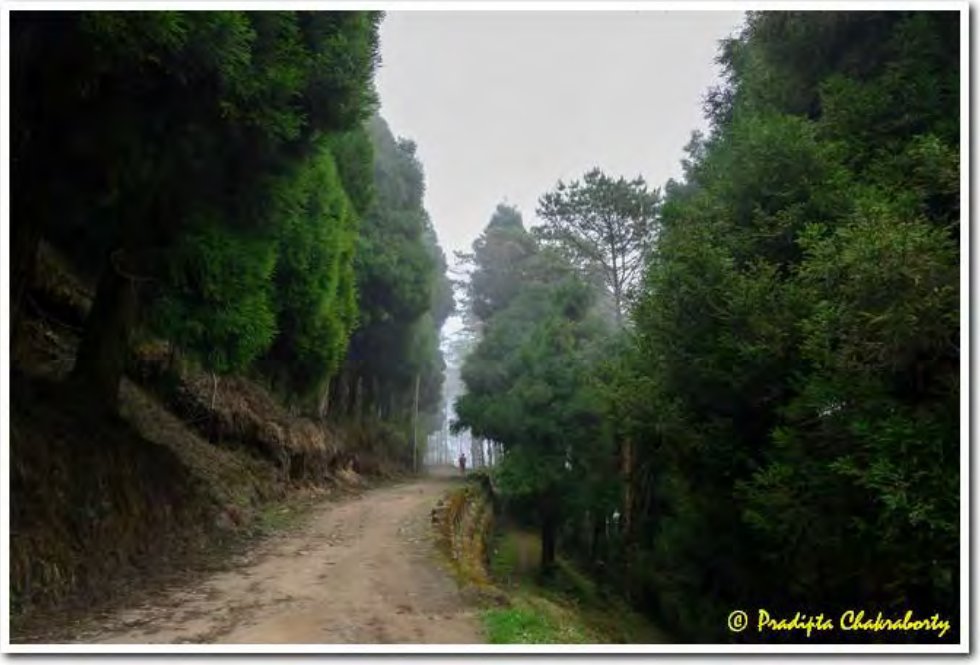

পথের সৌন্দর্য আর রোমাঞ্চ মন ভোলালেও শরীর জানান দিচ্ছে বয়স হয়েছে হে, এবার সামলে। একবার বসে, জল, চকোলেট খেয়ে আবার হাঁটা। এইভাবে একসময় পৌঁছে গেলাম ধোতরে। আগে থেকেই শেরপা লজে ঘর বুক করা ছিল। সুন্দর লোকেশন, কিন্তু পেশাদারিত্বের অভাব প্রকট। যাইহোক, একটা তো রাত, কেটে গেল।
পরদিন সকালে সুন্দরী ধোতরের রূপ দেখতে দেখতেই শিলিগুড়ির গাড়ি চলে এল। তারপর নটে গাছ মুড়নোর কথা। নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে দার্জিলিং মেলে কলকাতা। সঙ্গে কিছু ছবি আর একরাশ আত্মবিশ্বাস, হোক না উৎরাই, খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় ৭ কিলোমিটার হেঁটেছি তো। তাহলে এখনও ততো বুড়িয়ে যাইনি।

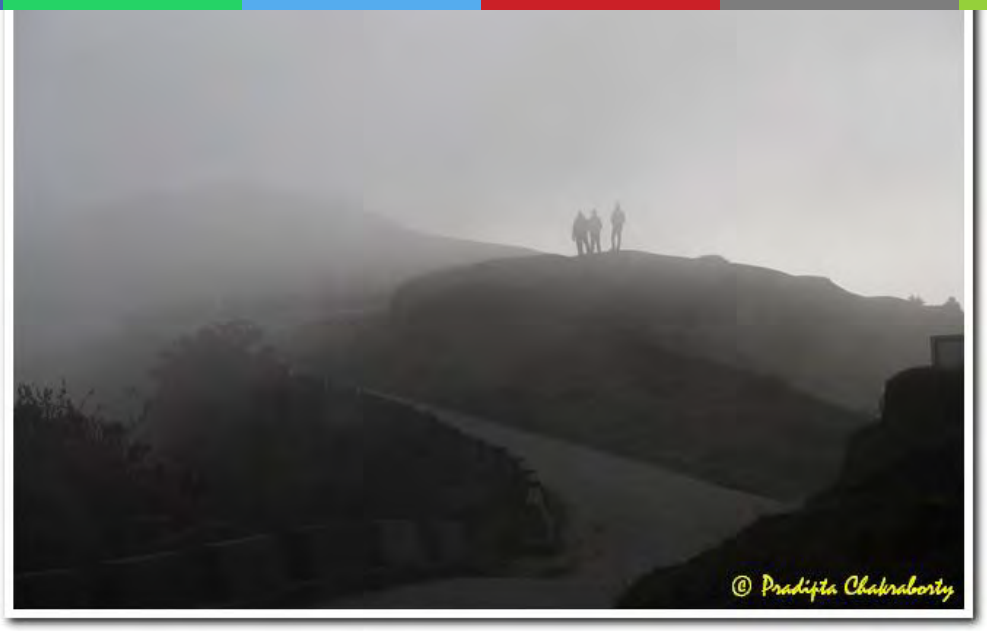

পেশায় শিক্ষক প্রদীপ্ত চক্রবর্তী নেশায় আলোকচিত্রী ও ভ্রামণিক।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher